প্রেম

প্রথম খণ্ড

সেবা প্রকাশনী

আতোয়ার রহমান

প্রেম

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সাহিত্য থেকে
নির্বাচিত সেরা প্রেমকাহিনী

আনোয়ার রহমান

প্রেম
মানুষের সবচেয়ে প্রিয়
সবচেয়ে কাম্য জিনিষ।
মানবমনের সবচেয়ে কোমল, সবচেয়ে মধুর,
সবচেয়ে দুর্বার অনুভূতি।
প্রেম—এই শব্দটির শুধুমাত্র উচ্চারণও
মনের ভেতর জাগিয়ে তোলে
এক স্বপ্নময় শিহরণ।
প্রেমের থেকে পুরোণো মানুষের কাছে
আর কিছুই নেই
তবু সে চিরনতুন
মানুষ থেকে মানুষে তার কত বিচিত্র রূপ!
প্রেমের তুলনা কেবল প্রেম।
তারই প্রমাণ এ বই।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

শো-রুম : ৩৬/১০, বাংলাবাজার, ঢাকা-১

আঠারো টাকা মাত্র

প্রকাশক :
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪, সেগুন বাগিচা, ঢাকা -২

লেখক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ : জুন, ১৯৮৫

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : আসাদুজ্জামান

মুদ্রণ :
ইসলামিয়া প্রেস
৪/৫ খিলগাঁও চৌধুরী পাড়া
ঢাকা-১৭

যোগাযোগের ঠিকানা :
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪, সেগুন বাগিচা, ঢাকা-২
জি, পি, ও, বক্স নং ৮৫০
দুরালাপন : ৪০৫৩৩২

শো-রুম :
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০, বাংলাবাজার,
ঢাকা-১

PREM
(Love Stories)
Translated and writed by
Atwar Rahman

সেবা প্রকাশনীর আরো ক'টি চমকপ্রদ গল্প-সংকলন :

কাজী আনোয়ার হোসেনের

ছয় রোমাঞ্চ

তিনটি উপন্যাসিকা

ছায়া অরণ্য

পঞ্চ রোমাঞ্চ

রবিনহুড

মঃ মাওলা চৌধুরীর

বিশ্বযুদ্ধের চমকপ্রদ কাহিনী

মোঃ মুমিনুর রহমানের

কাঠগড়ার মানুষ-১, ২, ৩,

রকিব হাসানের

জঙ্গল

শিকার-১, ২, ৩

শওকত চৌধুরীর

সপ্ত-আতংক

প্রেম

প্রথম খণ্ড

বিশ্ব সাহিত্য থেকে নির্বাচিত

সেরা প্রেমের গল্পের সংকলন

আতোয়ার রহমান

সূচীপত্র

আমেরিকা
এফ, স্কট ফিটজিরাল্ড /মায়াবিনী ৯
আয়র্ল্যাণ্ড
জেমস জয়েস/কানাগলি ৫৯
ইটালি
আলবার্তো মোরাভিয়া/লরি ড্রাইভার ৭৩
চীন
লু সুন/অতীতের জ্বালা ৮৮
জাপান
হায়াশি ফুমিকো/আশ্রয় ১২৭
জার্মেনী
আর্থার শ্নিৎস্লার/ভ্রষ্ট লগ্ন ১৫৪
শ্রীলঙ্কা
গুনসেন বিঠান/কমলির বাধা ১৮২

প্রেম

প্রথম খণ্ড

আতোয়ার রহমান

এফ. স্কট ফিটজিরাল্ড

মায়াবিনী

কোনো কোনো সহকারী গল্‌ফ খেলোয়াড় বেহদ্দ গরীব। তাদের সবাই এক-কামরাওয়ালা বাড়ীর বাসিন্দা। যার সামনে বাঁধা থাকে একটা রোগাটে গরু। কিন্তু ডেক্সটার গ্রীণের কথা আলাদা। ওর বাবা একটি মুদিখানার মালিক। ব্ল্যাক বিয়ারের সেরা মুদিখানা হল শেরী দ্বীপের টাকাওয়ালা লোকদের অনুগ্রহে পুষ্ট 'মধ্যমণি'। খ্যাতির দিক থেকে ডেক্সটারদের মুদিখানার স্থান ঠিক তার পরেই। ডেক্সটারের গল্‌ফ খেলা শুধু হাতখরচের জন্যে।

শরৎকালে মিনেসোটার দিনগুলো হয়ে ওঠে রুখুরুখু এবং ফ্যাকাসে। তারপর আসে দীর্ঘ শীতকাল। সে যেন সাদা একটা বাক্সের ডালা হয়ে সারাটা এলাকা ঢেকে রাখে। ডেক্সটার তখন গল্‌ফ কোর্সের ফেয়ারওয়ের বুকে জমে-ওঠা বরফের ওপর স্কী করে বেড়ায়।

এসব দিনে আশপাশের মাঠঘাটের দিকে চোখ পড়লে ওর

মনটা গভীর বিষণ্ণতায় নেতিয়ে আসে। গল্‌ফের মাঠগুলোর ওপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে বন্ধ্যা নির্জনতা, সারাটা শীতকালে যা ক্ষুণ্ণ হয় শুধু শীর্ণ কটি চড়ুইয়ের কলরবে,—এ-দৃশ্য ওর বুকটা যেন দুমড়ে দিয়ে যায়। গরমের সময় মাঠের হিল্‌-গুলো ঝলমল করে। কিন্তু শীতের সময় চাপ-বাঁধা এক হাঁটু বরফের নীচে চাপা পড়া নিঃসঙ্গ বালির বাক্স ছাড়া সেগুলোর আর কোনো পরিচয় নেই। হিল্‌গুলোর দিকে গেলে বাতাসের শনশনানিটাকে হু হু কান্নার মতো শোনায়। যদি কখনো রোদ ওঠে, আকার-আয়তনহীন, রুক্ষ, ঠিকরে-পড়া আলোর হাত থেকে চোখ বাঁচাতে গিয়ে ওকে বারবার হোঁচট খেতে হয়।

তারপর, এপ্রিলে, শীতটা হঠাৎ শেষ হয়ে যায়। বরফগুলো তখন তর তর করে ব্ল্যাক বিয়ার হ্রদে গিয়ে পড়তে থাকে। মওসুমের শুরুতেই যারা লাল-কালো বল নিয়ে বুক বেঁধে গল্‌ফের ময়দানে নেমে পড়ে, তাদের যে একটু বাধা দেবে, সে-ধৈর্যটুকুও তার নেই। কিছুমাত্র উচ্ছ্বাস না দেখিয়ে, আর্দ্র জ্যোতিধারে ক্ষণেকের তরেও যতি না দিয়ে, শীত উধাও হয়ে যায়।

ডেক্সটারের কিন্তু মনে হয়, উত্তর অঞ্চলের এই বসন্তকালের মধ্যে একটা বিষণ্ণতার ছায়া আছে। ঠিক যেমন শরৎকালের মধ্যে রয়েছে একটা জমকালো ভাব। শরৎ এলেই ওর হাত দুখানা মুঠি পাকিয়ে কাঁপতে থাকে। ঠোঁটের ফাঁকে ফাটা বুদ্বুদের মতো আওয়াজ তোলে কতকগুলো অর্থহীন উক্তি। কল্পিত শ্রোতৃমণ্ডলী আর সেনাবাহিনীকে আদেশদানের নানান আকস্মিক ভঙ্গিতে ওর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হয়ে ওঠে চঞ্চল।

তারপর অক্টোবর আসে বুক-ভরা আশা নিয়ে। যে-আশা

নভেম্বরে রূপ নেয় এক ধরনের বিজয়োল্লাসে। এরই মধ্যে কখন জানি শেরী দ্বীপের গরমের সময়কার ক্ষণস্থায়ী, উজ্জ্বল স্মৃতিকণা-গুলি অক্ষয় সম্পদে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

তখন ডেক্সটার হয় গল্‌ফ চ্যাম্পিয়ন। চমকপ্রদ এক প্রতি-যোগিতায় মিঃ টি. এ. হেডরিক ওর কাছে হার মানেন। কল্পনার ময়দানে ও বার বার এমনি প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়। এবং প্রতিবারই অক্লান্ত আয়াসে এই প্রতিযোগিতার রূপ একেবারে পালটে ফেলে। কখনো ও জয়লাভ করে প্রায় কৌতুকজনক অবলীলায়, কখনো বা হারতে হারতেও দর্শনীয় অগ্রগতির ফলে।

আবার, মাঝে মাঝে কল্পনায় ফুটে ওঠে আর এক দৃশ্য। ও যেন একখানা পিয়ার্স-এ্যারো গাড়ী থেকে মিঃ মর্টিমার জোন্সের মতো ভঙ্গিতে নেমে আসছে। তারপর ক্লান্ত পায়ে গিয়ে ঢুকছে শেরী দ্বীপ গল্‌ফ ক্লাবের বসবার ঘরে। কিংবা হয়তো ওর চার-পাশে ভীড় করে দাঁড়িয়ে আছে ভক্তের দল। আর, ও ক্লাবের মাচার স্প্রিং বোর্ড থেকে পানির ভেতর লাফিয়ে পড়ছে সখের ডাইভিংয়ের কলাকৌশল দেখাবার জন্যে। দর্শকদের ভেতর মিঃ মর্টিমার জোন্সের মুখখানা তখন বিস্ময়ে হাঁ হয়ে যাচ্ছে।

একদিন ঘটে যায় একটি মস্তো ঘটনা।

সেদিন জোন্স এসে দাঁড়ান ডেক্সটারের সামনে। না, কল্পনার জোন্স নন, বাস্তব জগতের মানুষটিই। তাঁর চোখ দুটি ভেজা-ভেজা। তিনি ডেক্সটারকে ডেকে বলেন, তুমি ক্লাবের সেরা সহকারী গল্‌ফ খেলোয়াড়। অথচ তুমি নাকি ঠিক করেছো, আর খেলবে না! অন্য খেলোয়াড়রা তো তেমন নয়। তারা সব

সময়ই আমার জন্যে কিছু না কিছু করছে। কিন্তু তুমি ভেবো না। তোমার একটা ব্যবস্থা আমি করে দেব। তাহলে আর খেলা ছাড়বে না তো ?

ডেক্সটার দৃঢ় গলায় বলে, না, স্যার, আমি আর সহকারী হয়ে থাকতে চাইনে।

তারপর একটু থেমে জুড়ে দেয়, আমি অনেক বড়ো হয়ে গেছি।

: তোমার বয়েস এখনো চৌদ্দো পেরোয়নি। অথচ আজ সকালে তুমি ঠিক করেছো, ক্লাবে আর থাকবে না। ব্যাপারটা কি, বলো তো ? তুমি না আমাকে কথা দিয়েছিলে, সামনের সপ্তাহে আমার সঙ্গে স্টেট টুর্ণামেণ্টে যাবে ?

: আমি কি আর ছোটো আছি ?

এবার ও 'প্রাথমিক শ্রেণী' লেখা ব্যাজটা ফিরিয়ে দেয়। তার-পর সহকারীদের প্রশিক্ষকের কাছ থেকে পাওনাগণ্ডা বুঝে নিয়ে ক্লাব থেকে বেরিয়ে পড়ে। হেঁটেই ব্ল্যাক বিয়ার গাঁয়ের দিকে রওনা হয়।

সেদিন বিকেলবেলা মিঃ মর্টিমার জোন্স এক পেয়ালা মদ সামনে নিয়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলতে থাকেন, ওর চেয়ে ভালো সহকারী আমি আর দেখিনি। ওর হাত থেকে কখনো বল ফসকায় না। খেলায় যেমন মনোযোগ, তেমনি বুদ্ধি। অথচ ও এতো শান্ত, এমন সৎ আর কৃতজ্ঞ !

ঘটনাটার মূলে ছিলো একটি ছোট্টো মেয়ে। বয়েস যার বছর এগারো।

চেহারাটা কুশ্রী। কিন্তু রূপের মতোই তারও একটা আকর্ষণ আছে। অনেক বাচ্চা মেয়ে কয়েক বছরের ব্যবধানেই অপরূপ সৌন্দর্যের অধিকারিণী হয় এবং পুরুষের অপরিসীম দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ-মেয়ে সেই জাতের।

মেয়েটির চটক অবশ্যি এই বয়েসেই চোখে পড়ে। তার ঠোঁট-বাঁকানো হাসির ভঙ্গিতে। এবং (এতোও আমাদের দেখতে হয়!) তার প্রায় উগ্র চোখ দুটিতে ফুটে আছে একটা সুপরিচিত, নিন্দনীয় বিদ্রোহ। এ-ধরনের মেয়েদের মধ্যে উদ্দামতা দেখা দেয় অল্প বয়েসেই। বিদ্রোহী মেয়েটির চোখে মুখে সে-ভাবটা অত্যন্ত স্পষ্ট। এবং সেটা তার ক্ষীণ দেহ থেকে একটা জ্যোতির মতো ঠিকরে পড়ছিলো।

গল্‌ফের ময়দানে সে এসেছিলো বড়ো আগ্রহ নিয়ে। বেলা তখন নয়টা। তার সঙ্গে ছিলো সাদা লিনেনের পোশাক-পরা এক আয়া। যার হাতে সাদা একটা চটের থলেয় গলফ খেলার গোটা পাঁচেক ছোটো ছোটো স্টিক। ডেক্সটার যখন প্রথম মেয়েটিকে দেখতে পায়, তখন সে সহকারীদের ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তার চোখে মুখে একটু যেন অস্বস্তির ভাব। এবং এই ভাবটুকু লুকোনোর জন্যে সে আয়াকে লাগিয়ে রেখেছে একটা স্পষ্টতঃই অস্বাভাবিক বিষয়ের আলোচনায়। যদিও সে-আলোচনা তার আকস্মিক এবং অসংবদ্ধ কতকগুলি মুখভঙ্গির মিশেলে মিষ্টি।

ক্রমে তার কথাগুলো স্পষ্ট হয়েই ডেক্সটারের কানে এসে পৌঁছলো, আজকের দিনটা সত্যিই চমৎকার, হিল্ডা।

কথা কয়টি উচ্চারণের সময় তার ঠোঁটের কোনা দুটো মোচড়

খেয়ে একবার নীচের দিকে নেমে যায়। সঙ্গে সঙ্গে মুখে ফুটে ওঠে এক ফালি হাসি। পরমুহূর্তেই চোখ দুটি চারদিকে একবার চোরা দৃষ্টি বুলিয়ে নেয়। এই অবসরে এক নিমেষের জন্যে ডেক্স-টারকেও স্পর্শ করে যায়।

তারপর মেয়েটি আয়ার উদ্দেশে বলে উঠলো, আজ বোধ হয় এখানে খুব বেশী লোকজন নেই।

আবার সেই হাসি। প্রাখর্যে উজ্জ্বল, কৃত্রিমতায় মুখর, আবেদনে অমোঘ।

আয়া শূন্য দৃষ্টিতে এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে বললো, এখন কি যে করি!

ঃ ঠিক আছে। আমি দেখছি।

ডেক্সটার একেবারে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো। মুখখানা একটুখানি হাঁ করে। ও যদি এক পাও এগিয়ে যায়, তাহলে ওর অপলক দৃষ্টিটা মেয়েটির চোখে পড়ে যাবে। এবং যদি পিছিয়ে আসে, মেয়েটির মুখখানা ও ভালো করে দেখতে পাবে না। সুতরাং চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকাই বাঞ্ছনীয়।

প্রথমে ও মুহূর্তখানেক বুঝতেই পারেনি, মেয়েটির বয়েস কতো হতে পারে। তারপর ওর মনে পড়ে, আগের বছর ও মেয়েটিকে কয়েকবার দেখেছে। তখন তার পরনে ছিলো খাটো স্কার্ট। কথাটা মনে পড়তেই ও হঠাৎ, নিজের অজানতেই, হেসে ওঠে। সংক্ষিপ্ত, টুকরোখানেক হাসি। এবং সে-হাসি ওকেই সচকিত করে। সঙ্গে সঙ্গে ও ঘুরে দাঁড়ায়। দ্রুত পায়ে সরে পড়বার চেষ্টা করে।

ঃ খোকা।

ডেক্সটার থমকে দাঁড়ালো।

: খোকা।

সন্দেহ নেই, মেয়েটি ওকেই ডাকছে। শুধু তা-ই নয়, ওই অর্থহীন, অযৌক্তিক হাসিটুকুর লক্ষ্যও ও-ই।

ডেক্সটার পরবর্তী জীবনে দেখেছে, ও-হাসির কথা অন্ততঃ-পক্ষে ডজনখানেক লোক মাঝবয়েস অবধি ভুলতে পারেনি।

: গলফ-মাস্টার কোথায়, বলতে পারো, খোকা ?

: উনি ট্রেনিং দিচ্ছেন।

: ও। সহকারীদের মাস্টার সাহেব কোথায় আছেন, জানো ?

: তিনি এখনো এসে পৌঁছননি।

: ও।

ডেক্সটারের জবাব শুনে মেয়েটি মুহূর্তখানেকের জন্যে দমে যায়। সে একবার এ-পায়ে, একবার ও-পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে থাকে।

আয়া বললো, আমাদের একজন সহকারী খেলোয়াড় দরকার। মিসেস মর্টিমার জোন্স আমাদের গল্‌ফ খেলতে পাঠিয়েছেন। কিন্তু খেলবো কি করে ? এখানে সহকারী কই ? কি যে করি, বুঝতে পারছিনে।

এবার মিস জোন্সের চোখে ফুটে ওঠে কুটিল দৃষ্টি। এবং তারপরই মুখে দেখা দেয় সেই হাসিটা। আয়াকে থেমে যেতে হয়।

ডেক্সটার আয়ার উদ্দেশে বললো, এখানে আমি ছাড়া আর কোনো সহকারী নেই। আর, আমিও এখান থেকে নড়তে পারবো না। সহকারীদের মাস্টার সাহেব যতোক্ষণ না আসছেন, আমাকেই

এখানকার সব কিছু করতে হবে।

মিস জোন্স আর তার সঙ্গিনী এবার সরে যায়। এবং ডেক্স-টারের থেকে একটা নিরাপদ দূরত্বে গিয়ে শুরু করে উত্তেজিত কথা কাটাকাটি। সেই তর্কাতর্কির শেষে দেখা যায়, মিস জোন্স থলে থেকে একখানা স্টিক টেনে নিয়ে প্রচণ্ড জোরে মাটিতে ঠুকছে। একটু পরই স্টিকখানা সে আবার তুলে ধরে। এবারে আরো জোরে ঠুকবে বলে। কিন্তু লক্ষ্য আর মাটি নয়। স্টিকখানা সাঁই করে নেমে আসে আয়ার বুকের ওপর।

কিন্তু আয়া খপ করে ধরে ফেলে, মিস জোন্সের হাতে একটা মোচড় দিয়ে স্টিকখানা কেড়ে নিলো।

মিস জোন্স ক্ষেপে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো, ছোটোলোক বুড়ী কোথাকার! তোর মুখে ঝাঁটা মারি।

তারপর আবার তর্কাতর্কি।

ডেক্সটার বুঝতে পারে, ব্যাপারটার মজা ওদের কথায় নয়, —ছড়িয়ে আছে গোটা দৃশ্যটায়। এবং এটুকু বুঝবার পর ওর কেবলই হাসি পেতে থাকে। কিন্তু যখনই হাসিটা সরব হয়ে উঠতে চায়, ও চেপে যায়। ওর উৎকটভাবে মনে হতে থাকে, ছোট্টো মেয়েটি আয়াকে পিটুনি দিলে মন্দ হত না।

দৃশ্যটির ওপর যবনিকাপাত হল সহকারীদের মাস্টার সাহেবের আকস্মিক আবির্ভাবে।

আয়া সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর কাছে আবেদন জানালো, মিস জোন্সের একজন অল্পবয়েসী সহকারী দরকার। কিন্তু এই ছেলেটি বলছে, মাঠে নামতে পারবে না।

ডেক্সটারও তক্ষুণি জানিয়ে দিলো, মিঃ ম্যাককেনা বলে

গিয়েছিলেন, আপনি যতোক্ষণ না আসেন, আমাকে এইখানেই থাকতে হবে।

মিস জোন্স বললো, আর কি? উনি তো এখন এসে গেছেন।

মাস্টার সাহেবের দিকে চেয়ে সে খুশী মনে একটুখানি হাসে। তারপর, থলেটা ধপ করে ফেলে দিয়ে উদ্ধত পায়ে মাঠের প্রথম হিলটির দিকে ছুট দেয়।

মাস্টার সাহেব ডেক্সটারের দিকে ফিরে বললেন, ব্যাপার কি? অমন পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে আছো কেন? যাও, খুকীর স্টিক-গুলো উঠিয়ে নিয়ে এসো।

ডেক্সটার জবাব দিলো, আজ বোধ হয় আমার মাঠে নামা হবেনা।

ঃ তুমি মাঠে নামবে না?

ঃ আমাকে বোধ হয় খেলা ছেড়ে দিতে হবে।

ব্যাপারটা গুরুতর। ডেক্সটার নিজের সিদ্ধান্তে নিজেই ভয় পেয়ে গেল। ও জনপ্রিয় সহকারী। গল্‌ফের মওসুমে ওর মাসিক আয় ছিলো তিরিশ ডলার। ব্ল্যাক বিয়ার হ্রদের আশপাশে আর কোথাও এতোটা রোজগার করা যাবে না। কিন্তু ওর মনে আঘাত লেগেছে এবং সে-আঘাতের বেদনা গভীর। প্রবল এবং আশু উৎ-ক্ষেপের একটা পথ না পেলে মানসিক বিক্ষোভের হাত থেকে রেহাই নেই।

কিন্তু ব্যাপারটা এতো সহজও নয়। ডেক্সটার জানে না, ও ওর শীতের স্বপ্নের হাতে পুতুল মাত্র। ওর পরবর্তী জীবন গাঁথা এমনি আরো অনেক ঘটনার সূত্রে।

আগে ওর শীতের স্বপ্ন ছিলো শুধুই শীতের। এখন অবশ্যি স্বপ্নগুলোর বিশেষ কোনো কাল নেই, বিশেষ কৌলিন্যও নেই। ওসব মুহূর্তে মুহূর্তে বদলে যায়। যদিও বিষয়টা ঠিকই থাকে।

তবু, ওই স্বপ্নগুলোরই তাড়নায়, বছর কয়েক পরে ও রাজ্যের সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ব্যবসা-বাণিজ্য বিষয়ক একটা পরীক্ষা পাশ করে ফেলে। পূব অঞ্চলের আরো পুরোশো, আরো বিখ্যাত একটি বিশ্ব বিদ্যালয়ে পড়বার একটি সুযোগও এসেছিলো। যদিও তার ফলটা থাকে অনিশ্চিত। ডেক্সটারের তখন হাতটান যাচ্ছে। ইতিমধ্যে বাবার ব্যবসা ক্রমেই ফুলে ফেঁপে উঠতে শুরু করেছে। তিনি ওর খরচ চালাতেও রাজী হয়েছিলেন।

কিন্তু ডেক্সটারের স্বপ্ন যদিও প্রথমে টাকাওয়ালা লোকদের ঘিরে থেকেছে, ওর ভেতর একান্তই স্নবমার্কা কিছু আছে, এমন ধারণা করবার কোনো কারণ নেই। ঝলমলে জিনিষ এবং ঝলমলে লোকের নিছক সংসর্গ ও কোনো দিন চায়নি। ওর কাম্য ছিলো ঝলমলে জিনিষগুলোর মালিকানা। কেন, ও তা নিজেও জানে না। অনেক সময় ও হাত বাড়িয়েছে একেবারে সেরা জিনিষটির জন্যে। আবার, মাঝে মাঝে সাধারণ জীবনের বিধিনিষেধের সঙ্গে লাগে ওর ঠোকাঠুকি।

ডেক্সটারের সমগ্র কর্মজীবন নয়,—এমনি একটি নিষিদ্ধ ব্যাপার নিয়েই গড়ে উঠেছে এই কাহিনী।

সহকারী জীবনের পর ডেক্সটার টাকা করেছে। ব্যাপারটা একটু বিস্ময়কর।

কলেজ থেকে বেরিয়ে ও চলে যায় ওদের অঞ্চলের একটা শহরে। যে শহরের ধনিকদের সহানুভূতি গ্রেট বিয়ারের সমৃদ্ধির

কারণ। সেখানে যাওয়ার পর ওর পুরো দুটি বছরও কাটে না। তার আগেই লোকে ওকে দেখিয়ে বলতে শুরু করে, একটা ছেলের মতো ছেলে বটে! ওর বয়েস তখন মাত্র তেইশ বছর। ডেক্স-টারের চারপাশে তখন বড়োলোকের ছেলেরা বেকায়দায় পড়ে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের শেয়ার উড়িয়ে দিচ্ছে। নয়তো পৈতৃক সম্পত্তি অনিশ্চিত ব্যবসায় লাগানোর চেষ্টা করছে। কিংবা এক কুড়ি চার খণ্ডে লেখা 'জর্জ ওয়াশিংটন কমার্সিয়াল কোর্স'-এর মধ্যে মুখ গুঁজড়ে পড়ে আছে। ডেক্সটার এরই মধ্যে কলেজের ডিগ্রী আর মুখের জোরে হাজারখানেক ডলার ধার নিয়ে একটা লণ্ড্রির পার্টনার হয়ে বসলো।

ও যখন পার্টনার হয়, তখন লণ্ড্রিটা ছিলো ছোটো। কিন্তু একটি কাজে বিশেষজ্ঞ বনে গিয়ে ও দোকানের চেহারাই দেয় পালটে। দোকান মিহি উলের গল্‌ফ মোজা ধোয়া শুরু করে বিলেতী কায়দায়। তাতে মোজা পরিষ্কার হয়, অথচ টেনে যায় না। এর বছরখানেকের মধ্যেই ওরা শুরু করে নিকারবোকার ধোয়ার কাজ। তখন শহরময় সব পুরুষের মুখে শোনা যায় শুধু এক বুলি, —শেটল্যাণ্ড গেঞ্জি এবং সোয়েটার পাঠাতে হবে ডেক্সটারের লণ্ড্রিতে। আর কিছু দিন পরই গিন্নীরাও তাঁদের লিনেনের পোশাক পাঠাতে শুরু করলেন ডেক্সটারের কাছে।

দেখতে দেখতে শহরের পাঁচটি এলাকায় চালু হয়ে যায় লণ্ড্রির শাখা। এবং এরপর, সাতাশ পেরুনোর আগেই, ডেক্সটার দেশের এ-অঞ্চলের সবচেয়ে বড়ো লণ্ড্রি-মালিক! তার মতো অতো দোকানের মালিকানা আর কেউ দাবি করতে পারে না!

আর, ঠিক এই সময়েই দোকানগুলো বেচে দিয়ে ও চলে

গেল নিউইয়র্কে।

কিন্তু এসবের সঙ্গে এই কাহিনীর কোনো সম্পর্ক নেই। আমাদের গল্প ওর বিপুল সাফল্যের প্রথম দিকের দিনগুলো নিয়ে।

ডেক্সটারের বয়েস তখন তেইশ। সেসময় যেসব প্রবীণ ওকে দেখিয়ে প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠতেন, তাঁদের দলে ছিলেন হার্ট নামে একজন গল্‌ফ খেলোয়াড়। তিনি একদিন ওকে এক-খানা কার্ড দেন। যে কোনো শনিবারে শেরী দ্বীপের গল্‌ফ ক্লাবে অতিথি হিসেবে যাওয়ার নিমন্ত্রণপত্র। কার্ডখানা পাওয়ার পর একদিন ও ক্লাবে গিয়ে সেখানকার খাতায় নাম সই করে।

এবং সেই দিনই ক্লাবের মাঠে হয় দুটি যুগলের এক খেলা। এক দিকে ডেক্সটার আর মিঃ হার্ট, আর এক দিকে মিঃ স্যাণ্ডউড আর মিঃ. টি. এ. হেডরিককে নিয়ে।

এই মাঠেই এক কালে ও সহকারী হিসেবে মিঃ হার্টের থলে নিয়ে ঘুরে বেড়াতো। মাঠের কোথায় কি আছে, তা আজও ও চোখ বন্ধ করে বলে দিতে পারে। কিন্তু তাতে কি? এসব কথা কাউকে বলবার প্রয়োজনই ও বোধ করে না। ও শুধু বারবার আড়চোখে তাকাতে থাকে সহকারী ছেলে চারটির দিকে। ছেলে কটি যখন ওদের পেছনে ছুটে বেড়ায়, ও তখন লক্ষ্য করবার চেষ্টা করে তাদের চোখের বিশেষ কোনো ঝলক, হাত-পায়ের বিশেষ কোনো ভঙ্গি। যা দেখে ওর নিজের ছেলেবেলার কথা মনে পড়তে পারে। যাতে ওর অতীত এবং বর্তমানের মধ্যেকার ব্যব-ধানটা ঘুচে যায়।

এ এক অদ্ভুত উপলক্ষ। আকস্মিকভাবে কতকগুলো পরি-

চিত অথচ ক্ষণস্থায়ী স্মৃতিতে ভরা। একবার ওর মনে হয়, এখানে ও অনধিকার প্রবেশের অপরাধে অপরাধী। পরমুহূর্তেই বুক ভরে ওঠে একটা গর্বে। মিঃ টি. এ. হেডরিকের থেকে ও অনেক ভালো খেলে। ভদ্রলোকের সঙ্গ রীতিমতো বিরক্তিকর। এবং এখন তাঁকে আর ভালো খেলোয়াড়ও বলা যায় না।

তারপর ঘটে যায় একটা বিরাট ঘটনা।

পনেরো নম্বর গ্রীনের কাছে মিঃ হার্ট একটা বল হারিয়ে ফেলেছেন। ওরা সবাই মিলে ঝাঁটার কাঠির মতো ঘাসের মধ্যে সেটা খুঁজে বেড়াচ্ছে। এমন সময় পেছন দিকের একটা হিল-এর আড়াল থেকে কে যেন স্পষ্ট গলায় হেঁকে উঠলো, চার!

হাঁক শুনেই খোঁজাখুঁজি বন্ধ করে ওরা ঘুরে দাঁড়ায়।

ঠিক সেই মুহূর্তেই হিল্-এর ওপাশ থেকে আকস্মিকভাবে সাঁই করে ছুটে আসে একটি নতুন, চকচকে বল। এবং এসে—লাগবি তো লাগ একেবারে মিঃ হেডরিকের তলপেটে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি চিৎকার করে ওঠেন, উঃ, গেছি! লোকে কেন যে এই ক্ষ্যাপা মেয়েলোকগুলোকে মাঠে আসতে দেয়! আর সহ্য হয় না।

উত্তরে হিল-এর ওপাশ থেকে একই সঙ্গে উঠে এলো একটি মাথা এবং একটি কথা, আমরা খেললে আপনারা কিছু মনে করবেন না তো?

মিঃ হেডরিক রাগে ফেটে পড়লেন, তোমার বল এসে আমার তলপেটে লেগেছে।

মেয়েটি এবার ওদের দিকে এগিয়ে এলো, ওমা, তাই নাকি? আমি দুঃখিত। কিন্তু—আমি তো আগেই হাঁক দিয়ে বলেছিলাম, চার।

এবার সে ওদের সবার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নেয়; তারপর তার চোখ দুটি ফেয়ারওয়েতে বল খুঁজে বেড়াতে থাকে। সেই সঙ্গেই সে প্রশ্ন করে, আমার বলটা কি ভাবে ছিটকে পড়েছে?

প্রশ্নটি সাদা মনে করা হল, না, ঠাট্টা করে, বলা মুশকিল।

অবশ্যি, একটু পরেই মেয়েটি সব সন্দেহ ঘুচিয়ে দেয়। হিল-এর ওপর থেকে তার সঙ্গিনী ডাক দিতেই সে উচ্ছল আনন্দে বলে ওঠে, এই যে আমি। বলটা ধাক্কা খেয়েছে। সেই জন্যে আমার আসতে একটু দেরী হয়ে গেল।

বলটি এগিয়ে নিয়ে সে লোহার স্টিক হাতে সংক্ষিপ্ত একটা শটের জন্যে তৈরি হয়ে দাঁড়ায়।

এবার ডেক্সটার ভালো করে তার দিকে তাকায়।

মেয়েটির গায়ে একটা নীল রঙের ডোরাকাটা জামা। গলায় আর কাঁধে সাদা বর্ডার দেওয়া। তার ফলে গায়ের কটা রঙটা যেন আরো প্রখর হয়ে উঠেছে। বাচালতা আর ক্ষীণ স্বাস্থ্যের জন্যে এগারো বছর বয়েসে মেয়েটির উগ্র চোখ আর ঝুলে-পড়া মুখখানা দেখলে হাসি পেতো। আজ সে-বাচালতাও নেই, সে-কৃশতাও নেই।

এখন মেয়েটি মারাত্মক রকমের সুন্দরী। গালের রঙ ছবির রঙের মতো,—মাঝখানে একটি জায়গায় গাঢ়, তারপর চারদিকে একটু একটু করে ফিকে হয়ে গেছে। যাকে বলে পাকা রঙ, এ তা নয়। বরং এর মধ্যে আছে একটা তারল্য, একটা উজ্জ্বলতা। এর আভা এমনি যে, মনে হয়, রঙটা যে কোনো মুহূর্তে ফিকে হয়ে যেতে পারে। এই রঙ এবং ঠোঁট দুটির চপলতা যেন এক নিরবচ্ছিন্ন প্রাণময় ধারার প্রতীক। মেয়েটি যেন এক সতেজ জীবন, এক উগ্র উদ্দামতার অধিকারিণী।

স্টিক ঘুরিয়ে একটি অধীর অথচ নিস্পৃহ ঘা মেরে মেয়েটি বলটাকে গ্রীনের ওপাশে একটা হিল-এর ওপর তুলে দেয়। তারপর মুখে চট করে এক টুকরো শুকনো হাসি ফুটিয়ে, অযত্নে উচ্চারিত একটা 'ধন্যবাদ' ছুঁড়ে দিয়ে, বলটার দিকে ছুটে যায়।

মুহূর্ত কয়েক পর, বল ঠুকতে ঠুকতে মেয়েটি চলে যেতেই, ডেক্সটারের পাশের টী থেকে মিঃ হেডরিক মন্তব্য করলেন, সেই জুডি জোন্স। ওর এখন কি দাওয়াই দরকার, জানেন? উপুড় করে ফেলে রেখে একনাগাড়ে ছয় মাস ধরে পাছার ওপর চাবুক মারা, তারপর সেকেলে গোছের কোনো ঘোড়সওয়ার ক্যাপ্টেনের সাথে গাঁটছড়া বেঁধে বিদেয় করে দেওয়া। ব্যস, আর কিছু নয়।

মিঃ স্যাণ্ডউডের বয়েস সবে তিরিশ পেরিয়েছে। তিনি বললেন, যা-ই বলুন, মেয়েটি কিন্তু সুন্দরী।

: সুন্দরী!—মিঃ হেডরিক ঘৃণাভরে উত্তর দিলেন, ওকে দেখলে মনে হয়, মুখখানা যেন সব সময় একটা চুমোর লোভে উঁচু হয়েই আছে! গরুর চোখের মতো ড্যাবা ড্যাবা চোখ দুটোর নজর খালি শহরের বাছুরগুলোর দিকে।

মিঃ হেডরিক মেয়েটির বাৎসল্যের প্রতি ইঙ্গিত করতে চাইছেন, এমনটি ধারণা করা শক্ত।

মিঃ স্যাণ্ডউড বললেন, চেষ্টা করলে ও বেশ ভালো গল্‌ফ খেলোয়াড় হতে পারবে।

মিঃ হেডরিক গম্ভীর মুখে রায় দিলেন, খেলার ও কিচ্ছু জানে না।

মিঃ স্যাণ্ডউড বললেন, শরীরের গড়নটা কিন্তু ভারী সুন্দর।

ডেক্সটারের উদ্দেশে চোখ টিপে মিঃ হার্ট ফুটকি কাটলেন,

বরং ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিন, সাহেব, ওর বল খুব জোরে চলে না।

বিকেলের শেষ দিকে আকাশটা যেন সোনায় সোনায় ভরে যায়। তারপর দিগন্তে দেখা দেয় লাল-নীল তরঙ্গ। এবং সেই তরঙ্গ থিতিয়ে যেতেই চারদিক ঘিরে নেমে আসে রাত্রি। পশ্চিম এলাকার গরমের সময়কার এই রাতগুলো ভারি মিষ্টি। নির্জলতায় ঝরঝরে এবং হাওয়ার মৃদু গুঞ্জনে মুখরিত।

ডেক্সটার গল্‌ফ ক্লাবের বারান্দায় বসে সন্ধ্যেটা উপভোগ করে। ক্রমে ঝিরঝিরে হাওয়াটায় জোলো ছোঁয়া লাগে, রূপোলী ঝালর ঝুলিয়ে উঠে আসে পুর্ণিমার চাঁদ। তারপর, চাঁদটা আর একটু ওপরে উঠতেই হ্রদের রূপ যায় পালটে। দিনের বেলার সাধারণ হ্রদটাকে এবার দেখা যেতে থাকে শুভ্র, নিস্তরঙ্গ এক সরোবরের মতো।

ডেক্সটার এবার স্নানের পোশাক পরে পানিতে নেমে পড়ে। সাঁতরাতে সাঁতরাতে গিয়ে ওঠে একেবারে সবচেয়ে দূরের মাচাটির কাছে। তারপর স্প্রিং বোর্ডের ভেজা চটের ওপর খানিকটা পানি গড়ালো, হাত-পা ছড়ানো বিশ্রাম।

পাশে একবার একটা মাছ লাফিয়ে ওঠে। পানির ওপর একটি তারার ঝলমলানি। হ্রদের চারপাশে আলোগুলো ঝিকমিক করে। উপদ্বীপের মতো একটা অন্ধকার জায়গায় কে যেন পিয়ানোয় গত কয়েক বছরের গরমের সময়কার গান বাজিয়ে চলেছে। গানগুলো 'চিন-চিন' 'দ্য কাউন্ট অব লুক্সেমবুর্গ' আর 'দ্য চকোলোট সোলজার'-এর।

পানির ওপর দিয়ে ভেসে আসা পিয়ানোর আওয়াজ ডেক্স-

টারকে সব সময়ই মোহিত করে। ও একেবারে নিশ্চুপ হয়ে শুয়ে বাজনা শুনতে থাকে।

পিয়ানোতে এখন যে-গৎটা বাজছে, পাঁচ বছর আগে সেটা ছিলো উচ্ছল এবং নতুন। ডেক্সটার তখন কলেজে দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। গৎটা একবার বাজানো হয়েছিলো একটা নাটঘরে। ওসব জায়গায় যাওয়া তখন ওর কাছে রীতিমতো বিলাসিতা। ও তাই গৎটা শুনেছিলো জিমনাসিয়ামের বাইরে দাঁড়িয়ে। সুরটা সেদিন ওর মনে এক গভীর আনন্দের আবেশ এনে দেয়।

আজও ওর মনে লাগছে সেই আনন্দেরই আবেশ। তীব্র এক রসানুভূতিতে বুকখানা ভরে গেছে। সেই অনুভূতির স্পর্শে একবার মনে হল, ওর জীবনটা নির্ভুল সুরে বাঁধা যন্ত্রের মতো। ওর আশপাশের সব কিছু থেকে ছড়িয়ে পড়ছে একটা উজ্জ্বল জ্যোতি। যে-জ্যোতি ওর জীবনে আর ফিরে নাও আসতে পারে।

হঠাৎ দ্বীপের অন্ধকারে একটা নীচু, ফ্যাকাসে, আয়তাকার ছায়া ছিটকে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে ছড়িয়ে যায় একখানা রেসিং মোটরবোটের ঘড়ঘড় আওয়াজ। তার পেছনে, চিড়-খাওয়া পানির ওপর দিয়ে, এগিয়ে আসতে থাকে দুখানা সাদা স্টীমার।

পিয়ানোর উচ্ছল টুংটাং পানির একটানা আওয়াজে ডুবিয়ে দিয়ে বোটখানা একটু পরেই ওর কাছাকাছি চলে আসে।

ডেক্সটার এবার হাতে ভর দিয়ে মাথাটা একটুখানি উঁচু করে বোটখানার দিকে চোখ ফেলে। হাল ধরে দাঁড়িয়ে আছে একটি ছায়ামূর্তি। তার কালো কালো চোখ দুটি ক্রমবর্ধমান জলীয় ব্যবধান উপেক্ষা করে ওর দিকে চেয়ে রয়েছে।

মুহূর্ত কয়েক পরই বোটখানা মাচা পার হয়ে যায়।

তারপর শুরু হয় পানির ফোয়ারা তুলে হ্রদের মাঝখানটায় উদ্দাম উদ্দেশ্যহীন চক্কর কাটা। এবং এক সময় বোটখানার মতোই উদ্দাম একটি তরঙ্গবৃত্ত আছাড় খেয়ে ভাঙতে ভাঙতে ওর মাচায় এসে লাগে।

এবার বোটের ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে যায়।

সঙ্গে সঙ্গে নারীকণ্ঠে উচ্চারিত হয়, কে ?

মেয়েটি খুব কাছে এসে পড়েছে। তার স্নানের পোশাকটাও দেখা যাচ্ছে। পোশাকটা যে গোলাপী কাপড়ের, তাও বুঝতে কষ্ট হয় না।

বোটের মাথাটা একবার মাচার গায়ে ধাক্কা খায়। মাচাটা এবার তির্যকভাবে একটুখানি উঁচু হয়ে ওকে মেয়েটির দিকে তুলে ধরে। সঙ্গে সঙ্গে অসম কৌতূহলে দুজনেই আবিষ্কার করে, ওরা পরস্পরের পরিচিত।

মেয়েটি প্রশ্ন করে, আজ বিকেলে যে গল্‌ফ খেলা হল, আপনিও তাতে ছিলেন, না ?

ডেক্সটার উত্তর দেয়, হ্যাঁ।

ঃ আচ্ছা, আপনি মোটরবোট চালাতে জানেন ? যদি জানেন, চালান না। আমি একটু পেছন দিকের সার্ফ-বোর্ডে গিয়ে বসি। আমার নাম জুডি জোন্স।

নামটা বলেই জুডি জোন্স ফিক করে ওর দিকে এক টুকরো অনুগ্রহের হাসি ছুঁড়ে দেয়।

অদ্ভুত ধরনের রহস্যময় হাসি। না, ভুল বলা হল। জুডি জোন্স ঠোঁট দুটি নিয়ে ইচ্ছেমতো খেলা করতে পারে। সে হয়তো

চেয়েছিলো অন্য কিছু। হাসিটাকে রহস্যময় করে তুলতে : কিন্তু সে যা-ই হোক, ডেক্সটারের কাছে হাসিটা বিটকেলে লাগে না। বরং মনে হয়, এ-হাসি নির্ভেজাল সুন্দর।

হাসিটুকুর পর জুডি জোন্স জুড়ে দেয়, আমি দ্বীপে থাকি। বাড়ীতে এক ভদ্রলোক আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন। উনি বলেন, আমি ওঁর আদর্শ রমণী। ভদ্রলোক আমার ওখানে আসতেই আমি তাই ঘাট থেকে বোট নিয়ে সরে পড়েছি।

আবার একটা মাছ লাফ দিয়ে ওঠে। আবার দেখা যায় একটি তারার ঝলমলানি আর হ্রদের পাশের আলোগুলোর ঝিকিমিকি।

ডেক্সটার জুডি জোন্সের পাশে বসে তার বোট চালানোর কৌশলটা শিখে নিলো।

তারপরই জুডি পানিতে নেমে পড়লো, কুটিল একটা ভঙ্গিতে সাঁতার দিয়ে গিয়ে উঠলো ভাসমান সার্ফ-বোর্ডে।

ডেক্সটার লক্ষ্য করলো, সাঁতার দেয়ার সময় জুডির দিকে ও চেয়ে থাকলে ক্লান্তি আসে না। এ যেন ঢেউয়ে ভাসা গুঁড়ি বা উড়ন্ত গাংচিলের দিকে চেয়ে থাকার মতোই সহজ। জুডির লালচে হাত দুখানা ফিকে উজ্জ্বল পানির তলায় বাঁকা হয়ে ঘুরে বেড়ায়। প্রথমে উঠে আসে কনুই। সুষম ধারায় গড়িয়ে পড়া পানির মতো কবজি অবধি অগ্রবাহু পেছন দিয়ে ঠেলে দিয়ে। তারপর শূন্যে প্রসারিত হয়ে হাত দুখানা আবার নেমে আসে। ছুরির ফলার মতো পানির ওপর বসে গিয়ে পথ কেটে নেয়।

ওরা মাচার পাশ ছেড়ে হ্রদের ভেতর দিকে চলে গেল।

ডেক্সটার একবার মুখ ফিরিয়ে দেখলো, সার্ফ-বোর্ডটা

তেরছাভাবে খাড়া হয়ে উঠেছে। মেয়েটি বসে আছে একেবারে পেছন দিকে, হাঁটু ভেঙে।

ও তাকাতেই জুডি বললো, আরো জোরে চালান। যতো জোরে পারা যায়।

ডেক্সটার সুবোধ বালকের মতো লিভারটা সামনের দিকে চেপে ধরলো।

আগা-গলুইয়ে শুভ্র জলোচ্ছ্বাসটা এবার আরো উঁচু হয়ে উঠলো।

ও আর একবার মুখ ফিরিয়ে জুডির দিকে চায়। জুডি এখন ছুটন্ত সার্ফ-বোর্ডটার ওপর খাড়া হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তার হাত দুখানা দু'পাশে প্রসারিত। চোখ চাঁদের দিকে।

এবারও ডেক্সটার জুডির দিকে চাইতেই সে গুটি দুয়েক কথা ছুঁড়ে দিলো, ভয়ানক ঠাণ্ডা। আপনার নাম কি?

ডেক্সটার নাম বললো।

: ইয়ে—কাল রাত্তিরে আমার ওখানে ডিনারে আসুন না!

ডেক্সটারের হৃৎপিণ্ডটা যেন বোটের প্রাই হুইলের মতো একটা পাক খেলো।

জুডির আকস্মিক খেয়ালিপনা দ্বিতীয়বার ওর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিলো।

পরদিন সন্ধ্যেবেলা।

জুডি তখনও নীচে নামেনি। তার জন্যে অপেক্ষা করে ডেক্সটার। কিন্তু বসে বসে নয়। ঘরে আর বারান্দায় পায়চারি করে বেড়ায় ও।

ঘরটা গরমের সময়ে ব্যবহার করবার মতোই বটে। একটা নরম প্রশস্ততায় স্নিগ্ধ। সামনেই এক ফালি খোলা বারান্দা।

এসব জায়গায় আরো কতো লোক পায়চারি করে গেছে, কে জানে! তারা জুডি জোন্সকে ভালোবেসেছিলো। ডেক্সটার জানে, তারা কি ধরনের মানুষ। ও যখন প্রথম কলেজে যায়, তখন সকলের আগে ওর চোখ পড়ে সুবেশ, স্বাস্থ্যবান একদল ছেলের ওপর: তারা এসেছিলো মস্তো এক প্রিপারেটরি ইস্কুল থেকে। জুডি জোন্সের প্রণয়ীরা ওই জাতের।

ডেক্সটার আরো দেখেছিলো, এক হিসেবে ও তাদের থেকে ভালো। আরো নতুন, আরো শক্তিমান। কিন্তু ও কামনা করে, ওর ছেলেমেয়েরা যেন ওই লোকগুলোর মতো হয়। এবং ওর এই কামনার মধ্যে ফুটে ওঠে একটি কথার পরোক্ষ স্বীকৃতি। অমন সুন্দর ছেলেরা চিরকালই হয় অমার্জিত, গাঁট্টাগোট্টা গোছের বাবার সন্তান। ও-ও সেই অমার্জিত দলের মানুষ।

ওর যখন ভালো কাপড়চোপড় পরবার মতো সুদিন আসে, দেশের সেরা দর্জিদের চিনে নিতে ওর দেরী হয়নি। আজকে ও যে-স্যুটটা পরে এসেছে, সেটাও ওই দর্জিদেরই একজনের তৈরি করা। ওর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেদের একটা বিশেষ ধরনের গাম্ভীর্য আছে। যা অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের থেকে তাদের ভিন্ন গোত্রের বলে চিহ্নিত করে রাখে। ডেক্সটারও ওর দলের আর সবার মতোই গম্ভীর। ওর জীবনে যে এ-ধরনের কেতাদুরস্তির প্রয়োজন আছে, তা ও মেনে নিয়েছে এবং তাকে গ্রহণও করেছে। ও জানে, আত্মবিশ্বাসের বেশী প্রয়োজন পড়ে—পোশাক-আশাক আর আচার-ব্যবহারে সাবধান হওয়ার বেলায় নয়,

বেখেয়াল হওয়ার সময়। কিন্তু বেখেয়ালিপনা আপাততঃ ওর ছেলেমেয়েদের জন্যে তোলা থাক। ওর মায়ের নাম কিম্‌স্‌ লিস। তিনি ছিলেন যাযাবর চাষী ঘরের মেয়ে। এবং জীবনের শেষ দিনটি তক ভাঙা ইংরেজী বলেছেন। তাঁর ছেলেকে বাঁধা নিয়ম মেনে চলতেই হবে।

জুডি জোন্স নীচে নামলো সাতটার কিছু পরে। তার পরনে নীল সিল্কের বৈকালিক পোশাক। ডেক্সটার একটু নিরাশই হল। কেন, এর থেকে ভালো কিছু কি পরা যেতো না?

এবং ওর নৈরাশ্য আরো খানিকটা গভীর হল, যখন সংক্ষিপ্ত এক কুশল প্রশ্নের পর জুডি জোন্স ভাঁড়ার ঘরের কাছে গিয়ে দরজা ঠেলে ডাক দিলো, মার্থা, এবার খাবার দিতে পারো। ডেক্সটার এতোক্ষণ আশা করেছে, চাকরানী নিজের থেকেই এসে বলবে, খানা তৈরী। ওর আরো আশা ছিলো, ককটেলও হবে।

কিন্তু যা হওয়ার, হয়ে গেছে। এসব চিন্তা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে ও জুডি জোন্সের সাথে একটা আরাম কেদারায় পাশাপাশি বসে পড়লো।

তারপর মুখোমুখি হয়ে দুজনে শুরু করলো গল্প।

জুডি কি যেন ভাবছিলো। এক সময় বলে, বাবা-মা আজ আসবেন না।

তার বাবার সাথে শেষবারের সাক্ষাতের কথা ওর এখনো মনে আছে। বাবা-মা আসবেন না শুনে ও মনে মনে খুশী হল। তাঁরা হয়তো ওকে দেখে ভাবতেন, এ আবার কে? ওর জন্ম মিনেসোটার কীব্‌ল্‌ গ্রামে। এখান থেকে পঞ্চাশ মাইল

উত্তরে। ব্ল্যাক বিয়ার গ্রাম নয়,—জন্মভূমি হিসেবে ও সব সময় কীব্‌লের নামই বলে থাকে। গ্রামাঞ্চলের মানুষ বলে নিজের পরিচয় দেওয়া এমন কিছু খারাপ নয়। অবশ্যি, সে-অঞ্চল যদি বেকায়দা রকমের কাছে না হয় এবং কেতাদুরস্ত হ্রদ এলাকাগুলো তাকে ওপরে ওঠার সিড়ি হিসেবে ব্যবহার না করে।

ওদের গল্পের বিষয় হল ওর বিশ্ববিদ্যালয়। আর, হ্রদের পাশের শহরটি। যা শেরী দ্বীপের সকল ঐশ্বর্যের উৎস। ডেক্সটার কথায় কথায় জানায়, গত দু'বছরে ও বহুবার বিশ্ববিদ্যালয়ে গেছে। তারপর বলে, কাল সকালেই আমাকে শহরে ফিরে যেতে হবে। সেখানে আমার লণ্ড্রির ব্যবসা বেশ জমে উঠেছে।

খাওয়ার সময় জুডি একটু চুপসে থাকে। ডেক্সটার এবার অস্বস্তি বোধ করে। তারপর জুডি খিটখিটে কর্কশ গলায় এক একটা কথা বলে, আর, ও বিব্রত হয়ে ওঠে। সে যখন ওর দিকে চেয়ে কিংবা মুরগীর একটা মেটেকে উপলক্ষ করে—অথবা অকারণেই—হাসতে থাকে, ও ক্ষোভের সাথে লক্ষ্য করে, হাসিটুকুর মূলে কোনো আনন্দ নেই। এমনকি, সামান্য কৌতুকবোধও। তার টুকটুকে ঠোঁটের কোণ দুটো বেঁকে গেলে ওর মনে হয়, এ যতোটুকু না হাসি, তার চাইতে বেশী চুমোর আমন্ত্রণ।

খাওয়ার পর জুডি ওকে অন্ধকার খোলা বারান্দায় নিয়ে আসে। আবহাওয়াটা নিজের থেকেই বদলে দিয়ে বলে, আমি যদি একটু কাঁদি, কিছু মনে করবেন না তো?

ডেক্সটার চট করে উত্তর দেয়, আমি বোধ হয় আপনাকে বিরক্ত করছি।

: না, না। আপনাকে আমার বরং ভালোই লাগছে। কিন্তু

আজ আমার বিকেলটা কেটেছে বড়ো সাংঘাতিকভাবে! এক ভদ্রলোকের দিকে একটুখানি টান ছিলো। তিনি আজ বিকেলে হঠাৎ বলে ফেলেছেন, তাঁর অবস্থাটা কাঙালের মতো। আগে তিনি এর সামান্য একটু আভাসও দেননি। কাজটা কি তাঁর খুব ভালো হয়েছে?

: তিনি হয়তো আপনাকে বলতে ভয় পাচ্ছিলেন।

জুডি বলে, ধরা গেল, ভয় পাচ্ছিলেন। কিন্তু—যদি পেয়েই থাকেন, তিনি গোড়াতেই ভুল করেছেন। বুঝলেন কিনা, আমি যদি তাঁকে গারব বলে জানতাম—। বহু গরিব লোককে নিয়ে আমি মাতামাতি করেছি এবং তাদের প্রত্যেককেই বিয়ে করবার আমার পুরো ইচ্ছে ছিলো। কিন্তু এই ভদ্রলোকের বেলায় আমি তেমন কিছু ভাবিনি। তাঁর জন্যে আমার যে দুর্বলতা ছিলো, আঘাতটার পরে তাও আর টিকে থাকার কথা নয়। তাহলে ব্যাপারটা কি রকম দাঁড়াচ্ছে? না, একটি মেয়ে যেন অবলীলায় তার প্রেমিককে বলে দিলো, সে বিধবা। প্রেমিকটির হয়তো বিধবা বিয়েতে আপত্তি নেই। কিন্তু—

সে হঠাৎ থেমে যায়। কথার মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে বলে, আমরাও যেন গোড়াতেই ভুল না করি। আচ্ছা, আপনি কি, বলুন তো?

ডেক্সটার মুহূর্তখানেক ইতস্ততঃ করে। তারপর বলে, আমি আদনা মানুষ। আমার জীবন অনেকটা ফটকাবাজারির মতো।

: আপনি কি গরিব?

ডেক্সটার খোলা মনে উত্তর দেয়, না। আমার আয় বোধ হ

উত্তর-পশ্চিম এলাকায় আমার বয়েসী অন্য যে কোনো লোকের থেকে বেশী। জানি, কথাটা অশোভন। কিন্তু আপনি আমাকে সঠিক পথে চলার পরামর্শ দিয়েছেন।

এক মুহূর্তের নীরবতা।

তারপর জুডির মুখে ফুটে ওঠে সেই বিচিত্র হাসি। সঙ্গে সঙ্গে তার ঠোঁটের কোনা দুটো একটুখানি ঝুলে পড়ে। সোজা ওর চোখে চোখ রেখে, শরীরটায় প্রায় অলক্ষ্য এক ঝাঁকুনি দিয়ে, জুডি ওর আরো কাছে সরে আসে।

ডেক্সটার নিঃশ্বাস বন্ধ করে অপেক্ষা করতে থাকে। দু'জোড়া ঠোঁটের স্পর্শে রহস্যজনকভাবে কি যেন এক যৌগিক জিনিষ জন্ম নেবে। এবং তার সাথেও ওকে এখন মোকাবেলা করতে হবে।

পরমুহূর্তেই ও দেখে, জুডি চুমোয় চুমোয় তার সমস্ত উত্তেজনা ওর মধ্যে সঞ্চারিত করে দিচ্ছে। অকৃপণভাবে, গভীর ধারায়। এ চুমো প্রতিশ্রুতির নয়, পূর্তির। এতে ওর মধ্যে যা জেগে উঠছে, তা বারবার উগ্র হয়ে ওঠবার ক্ষুধা নয়, ভূরিভোজনের অনুভব। সাধ চাইবে ক্রমেই বেড়ে উঠতে। হ্যাঁ, জুডির চুমো উদার হাতের দানের মতো। যে-দান কিছুই রাখতে দেয় না, শুধুই অভাব সৃষ্টি করে।

ডেক্সটারের বুঝতে খুব বেশী দেরী হল না, ওর গর্বিত, উচ্চাভিলাষী কৈশোর থেকেই ও জুডি জোন্সকে কামনা করে এসেছে।

শুরুটা এমনি ভাবেই হল।

তারপর ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত গড়িয়ে গেল বাঁধা পথে।

শুধু তার গতির তীব্রতায় মাঝে মাঝে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটিয়ে। ডেক্স-টার নিজের একটি অংশকে তুলে দিলো একান্ত অকপট এবং অব্যবস্থিতচিত্ত একটি মানুষের হাতে। এমন মানুষের সাথে ওর আর কখনো পরিচয় হয়নি।

জুডির মন যা চায়, তারই জন্যে সবটুকু সৌন্দর্যকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। তার কৌশল বদলায় না, মান-মর্যাদার জন্যে ছল-চাতুরী থাকে না, পরিণতির জন্যে মনে দুশ্চিন্তাও দেখা দেয় না।

তার ক্রিয়াকলাপে মানসিক দিক থেকে যেটুকু জিনিষ থাকে, তা না থাকারই সামিল। সে চায় শুধু সবাইকে তার দেহ-সৌন্দর্যের সম্বন্ধে চরমভাবে সচেতন করে তুলতে।

ডেক্সটারের একটি কামনা তাই অদম্যা জুডিকে বদলে নিতে হবে। তার দুর্বলতাগুলোর সাথে একটা তীব্র রজোময় শক্তিও জড়িয়ে আছে। সে-শক্তি আপন সীমা পেরিয়ে এসে দুর্বলতাগুলোকে সঙ্গতির রূপ দেয়।

প্রথম রাত্তিরে জুডি ওর কাঁধে মাথা রেখে মৃদু গলায় বলে-ছিলো, আমার কি যে হয়েছে, বুঝতে পারছিনে। গত রাত্তিরেও আমি ভাবছিলাম, অন্য কাউকে ভালোবাসি। আর, আজ মনে হচ্ছে, ভালোবাসি তোমাকে।

ডেক্সটারের সেদিন মনে হয়েছিলো, এতো মিষ্টি, এতো রোমান্টিক এই কথাগুলো! সেই মুহূর্তে ও অনুভব করে, ওর মধ্যে দেখা দিয়েছে উত্তেজনা সৃষ্টির এক দুর্বার ক্ষমতা। এবং ও-ই ছিলো তখন সার্বভৌম। ক্ষমতাটুকু সর্ববিধ উপায়ে নিয়ন্ত্রণ করবার অধিকারী।

কিন্তু সপ্তাহখানেক পর ও এই গুণটিকেই দেখতে বাধ্য হল অন্যভাবে।

জুডি ওকে সেদিন তার লঞ্চে করে এক নৈশ চড়ুইভাতিতে নিয়ে গিয়েছিলো। খাওয়াদাওয়ার পর লঞ্চে চেপেই সে অন্য একটি লোকের সাথে উধাও হয়ে যায়। ডেক্সটারের মনটা তখন একেবারেই ভেঙে পড়ে। দলের আর সবার সাথে সামান্য ভদ্রতা-টুকু রক্ষা করে চলাও হয়ে ওঠে ওর পক্ষে কষ্টকর।

তারপর জুডি ফিরে এসে ওকে আশ্বাস দিয়ে জানালো, সে লোকটিকে চুমো খায়নি।

ডেক্সটার বোঝে, কথাটা মিথ্যে। তবু একটা জিনিষ দেখে ও খুশী হল। জুডির যতোই দোষ থাক, ওর কাছে মিথ্যে কথা বলবার কষ্টটুকু তো স্বীকার করেছে।

গরমের কটি মাস পার হওয়ার আগেই ও আর একটি ব্যাপার লক্ষ্য করে। জুডির পাশে সব সময়ই অন্ততঃপক্ষে ডজনখানেক লোক ঘুরে বেড়ায়। ও-ও তাদেরই একজন। মাঝে মাঝে এই মধুচক্রের সদস্য বদলে যায়। চক্রের প্রত্যেক ভক্তই কোনো না কোনো সময়ে আর সবার থেকে বেশী অনুগ্রহ লাভ করেছে। কখনো কখনো সেই অনুগ্রহের সাময়িক পুনরাবৃত্তি ঘটে। জন-ছয়েক লোক আজও তারই সান্ত্বনার রোদ পোহায়। দীর্ঘ অব-হেলায় বীতস্পৃহ হয়ে কেউ সরে পড়বার উপক্রম করলে জুডি সংক্ষিপ্ত কয়েকটি মিষ্টি মুহূর্তের সাহচর্য দেয়। মানুষটি তখন নতুন উৎসাহ পায়। জুডি এসব কৌশল প্রয়োগ করে তাদের ওপর, যারা অসহায়। কিন্তু তার মধ্যে হিংসাদ্বেষ থাকে না। বস্তুতঃ, তার কার্যকলাপের ভেতর যে অনিষ্টকর কিছু থাকতে পারে,

সব কিছুতে না হলেও অন্ততঃপক্ষে অর্ধেক ক্ষেত্রে, সে-বিষয়ে সে সচেতন।

ডেক্সটারের আর একটি আবিষ্কার, শহরে নতুন কোনো লোক এলে পুরোণো ভক্তদের আর খুঁজে পাওয়া যায় না। জুডির সাথে তাদের ওঠাবসা, চলাফেরার সমস্ত ব্যবস্থা তখন আপনা থেকেই বাতিল! কিন্তু এর কোনো প্রতিকার নেই। ভক্তরা এ-ব্যাপারে অসহায়। কেননা, এসব ক্ষেত্রে যা করবার, তা জুডি নিজেই সেরে নেয়। সে কাঁচা মেয়ে নয়। অগ্রগতির অর্থে যাকে বলা হয় 'জয় করে নেয়া', জুডির ক্ষেত্রে তার আশা করা বৃথা। চাতুরীতে সে হার মানে না, কেউ তাকে ভোলাতেও পারে না। অতি বুদ্ধির লড়াই বা সর্বগ্রাসী প্রভাবের সামনে পড়লে গোটা ব্যাপারটাকে সে এক মুহূর্তেই করে তোলে দৈহিক। এবং জুডির দেহশ্রীর জাদুস্পর্শে যে খেলা শুরু হয়, তা একান্তই তার নিজের। অন্যের সব শক্তি, সকল প্রতিভাই সেখানে অচল। জুডির তৃপ্তি শুধু তার আপন কামনা-বাসনার নিবৃত্তিতে এবং তারই আপন মোহিনী শক্তির প্রত্যক্ষ প্রয়োগে। আত্মরক্ষার প্রচেষ্টায় সে নিজেকে গড়ে তুলতে শিখেছে একান্তভাবেই ভেতর থেকে। এর মূলে আছে হয়তো তার জীবনের সাথে জড়িত তরুণ প্রেমের প্রাচুর্য, তরুণ প্রেমিকের অমিত আবির্ভাব।

ডেক্সটারের প্রথম উল্লাসের পর তাই দেখা দেয় অস্থিরতা আর অতৃপ্তি। নিজেকে জুডির মধ্যে হারিয়ে ফেলবার দুর্নিবার আনন্দে নেশা ধরায়, মনটাকে চাঙ্গা করে তোলে না।

ওর বরাত ভালো, শীতের সময় ও কাজের মধ্যে ডুবে থেকেছে। তার ফলে ওই আনন্দ ঘন ঘন এলো না। ওদের

পরিচয়ের প্রথম দিকে একবার ওর মনে হয়, ওরা এক গভীর, স্বতঃস্ফূর্ত পারস্পরিক আকর্ষণে আবদ্ধ। সেই প্রথম আগস্টে ওর তিনটি দীর্ঘ সন্ধ্যা কেটেছিলো জুডির বাড়ীতে আবছা অন্ধকারে ঢাকা বারান্দায়। আর, ছায়াময় কুঞ্জে বা বাগানের ঝোপঝাড়ে পর্দা টানা ডালপালার আড়ালে শেষবিকেল ভরে উঠেছে অদ্ভুত গোপন চুমোয়। সকালবেলা জুডিকে মনে হত স্বপ্নের মতো স্নিগ্ধ। অমলিন কাঁচা আলোয় সে ওর সামনে আসতে একটু যেন লজ্জাই পেয়েছে। তখন সব কিছুই ভরে রাখতো একদা প্রতিশ্রুত দাম্পত্য সম্পর্কের আনন্দ। এবং ওরা যে আসলে বাগ্‌দত্ত নয়, এই জ্ঞান ওর সেই আনন্দকে করে তুলেছে আরো প্রখর।

ওই তিন দিনের মধ্যেই ও প্রথমবার জুডির কাছে বিয়ের প্রস্তাব করে।

উত্তরে জুডি বলেছিলো, হয়তো একদিন আমি তোমায় বিয়ে করবো। এখন আমায় একটা চুমো দাও। তোমায় বিয়ে করতে পারলে আমি খুশীই হবো। তোমাকে আমি ভালোবাসি।

আসলে সে কিছুই বলেনি।

দিন তিনটির অনুবৃত্তিতে ছেদ পড়েছিলো নিউইয়র্ক থেকে এক ভদ্রলোকের আবির্ভাবে। তিনি সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি তক জুডির বাড়ীতে কাটিয়ে যান। এই সময় একটা গুজব শুনে ডেক্সটার অপরিসীম মানসিক কষ্ট পায়। ও শুনেছিলো, জুডি নাকি ভদ্রলোককে বিয়ে করবে বলে কথা দিয়েছে। তিনি মস্তো এক টাস্ট কোম্পানির প্রেসিডেন্টের ছেলে।

কিন্তু মাসখানেক পর খবর পাওয়া গেল, জুডি হাই তুলছে। একদিন রাত্তিরে তার যখন ওই ভদ্রলোকের সঙ্গে নাচে যাওয়ার

কথা, জুডি তখন সারাটা সন্ধ্যা কাটিয়ে দেয় মোটরবোটে স্থানীয় এক সুশ্রী তরুণকে নিয়ে। নিউইয়র্কের ভদ্রলোক এদিকে তাকে ক্লাবে খুঁজে খুঁজে হয়রান। জুডি তার মোটর বোটের সঙ্গীকে জানায়, অতিথির জ্বালায় সে বিরক্ত।

তার ভাবগতিক দেখে দিন দুয়েক পরেই ভদ্রলোক সরে পড়লেন।

জুডিকে অবশ্যি ষ্টেশনে তাঁর সঙ্গে দেখা যায়। কিন্তু লোকে বলাবলি করতে লাগলো, ভদ্রলোককে তখন সত্যিই বড়ো বিষণ্ণ দেখাচ্ছিলো।

গরমের কটি মাসও এমনি করেই কেটে যায়।

ডেক্সটারের বয়েস এখন চব্বিশ। ও এবার আবিষ্কার করে, নিজের ইচ্ছেমতো চলবার ক্ষমতা ওর ক্রমেই বেড়ে চলেছে। এই সময় ও শহরের দুটি ক্লাবে যোগ দেয়। এবং তার একটিতে থাকবার ব্যবস্থাও করে ফেলে। দেখা যায়, ক্লাব দুটির কেউ কেউ ভাবে, তাদের উৎসবে অনুষ্ঠানে ওর উপস্থিতি অপরিহার্য।

তবু, কোথাও জুডি জোন্সের নাচের সম্ভাবনা দেখলে ও যেভাবেই হোক কাছাকাছি থাকবার ব্যবস্থা করে নেয়। এখন ওর তরুণ সাহচর্য কারো কাছেই অবাঞ্ছনীয় নয়। এবং শহরের বসতি-এলাকার মেয়ের বাপদের কাছে তো ও রীতিমতো জনপ্রিয়। এদিকে, জুডি জোন্সের প্রতি অকপট অনুরাগে ওর মানমর্যাদার ভিত যেন আরো দৃঢ় হয়ে গেছে। সুতরাং ও যদি চায়, লোকের সাথে সামাজিকভাবে যথেষ্ট মেলামেশা করতে পারে।

কিন্তু ওর কোনো সামাজিক উচ্চাভিলাষ নেই। ক্লাবে

বৃহস্পতিবার বা সপ্তাহশেষের পার্টির প্রতি যাদের সব সময় প্রবল আসক্তি দেখা যায় এবং তরুণ দম্পতিদের সাথে যারা ডিনারে ভীড় করে, ওর মনে তাদের জন্যে বরং একটু ঘেন্নাই আছে। ও এরই মধ্যে ভাবতে লেগেছে, নিউইয়র্কে চলে যাবে। এবং ইচ্ছে আছে, জুডি জোন্সকে সঙ্গে নেবে। জুডি যে-জগতে মানুষ হয়েছে, তার জন্যে ওর মনে এখন আর কোনো মোহ নেই। কিন্তু এই বিদুরিত মোহও জুডির লোভনীয়তা সম্পর্কে ওর মোহ দূর করতে পারেনি।

কথাটা মনে রাখা দরকার। কেননা, জুডির জন্যে ও যা কিছু করে, তার ব্যাখ্যা মেলে শুধু এরই মধ্যে।

জুডির সঙ্গে পরিচয় হওয়ার আঠারো মাস পর ও অন্য একটি মেয়েকে বিয়ে করবে বলে কথা দিয়ে ফেলে। মেয়েটির নাম আইরিণ শীয়ারার। ডেক্সটারের ওপর যাঁদের আস্থা সব সময় অবিচল, আইরিণের বাবা তাঁদেরই একজন। মেয়েটার চুলের রঙ হালকা সোনালী, চেহারাটা মিষ্টি, শরীরটা একটু আঁটো-সাটো এবং আচার-আচরণ শ্রদ্ধা করবার মতো। আগে আরো দুটি ছেলে তাকে ভালোবাসতো। ডেক্সটার যখন আনুষ্ঠানিকভাবে তার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করে, সে মিষ্টি কথায় ছেলে দুটিকে সরিয়ে দেয়।

গরমের পর শরৎ আসে। তারপর শীত, বসন্ত, তারপর আবার গরমের দিন, আবার শরৎ।

কর্মব্যস্ত জীবনের এতোগুলো দিন ডেক্সটার জুডি জোন্সের সংশোধনের অতীত ঠোঁট দুটিতে বিলীন করে দেয়। ওর প্রতি ব্যবহারে জুডির কখনো দেখা গেছে আগ্রহ আর উৎসাহ, কখনো

কুটিলতা আর কুবুদ্ধি, কখনো বা উপেক্ষা আর ঘৃণা। এসব ক্ষেত্রে মানুষকে ছোটো ছোটো ব্যাপারে যতো রকমে এবং যতোটা অপমানিত আর খাটো করা সম্ভব, জুডি তা করেছে। ওকে যে জুডির একদিন ভালো লেগেছিলো, এ যেন তারই প্রতিশোধ।

জুডি ওকে ইশারায় কাছে ডেকে ওর দিকে চেয়ে হাই তুলেছে, তারপর আবার ইশারা করে সরিয়ে দিয়েছে। ও জুডির ডাকে এগিয়ে যেতো একটা তিক্ততা নিয়ে। চোখ দুটি কুঞ্চিত করে। জুডি ওর মনে এনেছে প্রচণ্ড উল্লাস। কখনো বা অসহনীয় যাতনা। জুডির জন্যে ও বহুবার অকথ্য অসুবিধায় পড়ে। কষ্ট যা ভোগ করে, তাও কম নয়। সে-কষ্ট নানাবিধ। শুধুমাত্র কৌতুকের জন্যে জুডি ওকে হতমান করেছে, ওর মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খেয়েছে এবং তার প্রতি ওর ভালোবাসাকে ওরই আপন কাজে আগ্রহ বিঘ্নিত করবার অস্ত্র বানিয়ে তুলেছে। কিছুই সে বাকী রাখেনি।

বাদ দিয়েছে শুধু একটি জিনিষ। সে হল— ওর সমালোচনা। জুডির সারা মন জুড়ে থেকেছে ওর প্রতি নিদারুণ উদাসিনতা। এবং সে-উদাসিনতা তার আচার-আচরণে সব সময় ফুটে উঠতো। জুডি হয়তো সামান্য সমালোচনা দিয়ে তার এতো বড়ো জিনিষটাকে খাটো করতে চায়নি।

এবার শরৎ পেরিয়ে যেতেই ডেক্সটার বুঝতে পারে, জুডি জোন্সকে পাওয়া সম্ভব নয়। মন কথাটা কিছুতেই মানতে রাজী হয় না। কিন্তু অনেক করে বুঝিয়ে ও মনকে বিশ্বাস করায়। কিছু-ক্ষণ রাত জেগে মনে মনে তর্ক চালিয়ে। জুডি ওর যতো দুঃখ-কষ্টের কারণ হয়েছে, তার কিছুই ও আজও ভোলেনি। স্ত্রী

হিসেবে জুডির মধ্যে কি কি বিকট দোষ দেখা যাবে, তাও একটি একটি করে বলে দিতে পারে।

দোষগুণের এই সব হিসেবের শেষে ওর অবশ্যি নতুন করে মনে পড়ে, জুডিকে ও ভালোবাসে।

হিসেব সেরে একটু পরেই ও ঘুমিয়ে পড়ে।

তারপর সপ্তাহখানেক সময় কাটে ওর নিজের সাথে লড়াই করে। টেলিফোনে জুডির গলাটা শোনায় খনখনে লাঞ্চের টেবিলে সে বসতো ডেক্সটারের উলটো দিকে, ওর দিকে চোখ রেখে। পাছে এমনি সব কথা মনটা জুড়ে বসে, সেই ভয়ে ও মাথা গুঁজে দেয় কঠিন আর অতিরিক্ত খাটনির ভেতর। এবং সেই সঙ্গেই বসে রাত্তিরে অফিসে গিয়ে ভবিষ্যৎ জীবনের পরিকল্পনা তৈরি করতে।

শেষে একদিন ও আবার নাচে যায় এবং হঠাৎ এক সময় জুডির সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু তার সাথে ওর পরিচয় হওয়ার পর বলতে গেলে এই প্রথম জুডিকে নিরিবিলিতে ওর পাশে এসে বসবার অনুরোধ জানায় না। কিংবা বলে না, তোমাকে চমৎকার দেখাচ্ছে।

জুডি অবশ্যি তার জন্যে কিছুই মনে করে না।

ব্যাপারটা লক্ষ্য করে ও দুঃখ পায়।

কিন্তু এই পর্যন্তই। এরপর ও যখন দেখে, জুডির পাশে আজ একটি নতুন লোক জুটেছে, ওর মনে একটু ঈর্ষাও জাগে না। ঈর্ষায় ভেঙে না পড়বার মতো মনের জোর ও অনেক আগেই অর্জন করেছিলো।

নাচের আসরে ও অনেক রাত অবধি থাকে। ঘন্টাখানেক

সময় কাটায় আইরিণ শীয়ারারের সাথে সাহিত্য আর গান-বাজনা নিয়ে আলোচনা করে। এসবের কোনোটিতেই ওর জ্ঞান উল্লেখযোগ্য নয়। কিন্তু এখন ও নিজের সময় আপন ইচ্ছামতো কাজে লাগাতে শুরু করেছে। এবার ওর মনে যেন একটা গর্বিত ধারণা জাগে, ওর—বয়েসে তরুণ এবং এরই মধ্যে কর্মজীবনে কল্পনাতীতরূপে সফলকাম ডেক্সটার গ্রীণের—সাহিত্য আর গান-বাজনা সম্বন্ধে আরো কিছু জানা উচিত।

এসব অক্টোবরের কথা। ওর বয়েস যখন পঁচিশ। জানুয়ারিতে ও আর আইরিণ বিয়ের জন্য বাগ্‌দত্ত হয়। কিন্তু ঠিক করা থাকে, বাগ্‌দানের কথাটা এখন গোপন রাখবে। অন্য লোককে জানতে দেওয়া হবে জুন মাসে। এবং বিয়ে তার মাস তিনেক পরে।

মিনেসোটার শীতকাল সহজে ফুরোতে চায় না। হাওয়াটা স্নিগ্ধ হয়ে উঠতে উঠতে প্রায় মে মাস এসে যায়। তখন বরফগুলোও গলে গিয়ে ব্ল্যাক বিয়ার লেকে পড়তে শুরু করে।

এবার ডেক্সটারের মনটা বিশেষ এক প্রশান্তিতে ভরে আসে। এক বছরেরও ওপর ও ছিলো এ-ধরনের প্রশান্তি থেকে বঞ্চিত। জুডি জোন্স কিছু দিন আগে ফ্লোরিডায় যায়। তারপর গেছে হট স্প্রিংসে। শোনা যায়, কোথায় জানি সে কাকে বিয়ে করবে বলে কথা দেয়। কিন্তু আর এক জায়গায় গিয়ে সে-কথা ফিরিয়ে নিয়েছে। প্রথমে ও যখন সন্দেহাতীতরূপে জুডি জোন্সের সঙ্গ ত্যাগ করে, তখন একটা ব্যাপার লক্ষ্য করে ও দুঃখ পেতো: লোকে তখনও তার সাথে ওর নামটা জড়িয়ে রেখেছিলো এবং ওর কাছে জুডির

খবরাখবর জানতে চাইতো। কিন্তু যখন ডিনারে আইরিণ শীয়ারারের পাশে ওর জায়গা হতে থাকে, তখন লোকে ওকে প্রশ্ন করা ছেড়ে দেয়। এবং এবার তারাই ওকে শুনিয়ে যায় জুডি সম্পর্কে নিত্য নতুন কথা। এতো দিনে ওর জুডি-বিশেষজ্ঞ জীবনের অবসান ঘটে।

অবশেষে মে মাস আসে।

বাদলা দিনের মতো স্যাঁৎসেঁতে অন্ধকার পথে নামলে এখন ও একটা কথা ভেবে অবাক হয়ে যায়। বহু উন্মত্ততা বড়ো শীগগির নামমাত্র আলোড়ন জাগিয়েই, ওর জীবন থেকে বিদায় নিয়েছে। আগের বছরের মে মাসটি জুডির উগ্র, ক্ষমাহীন অথচ ক্ষমাকরে-দেওয়া উৎপাতে অবদারে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিলো। জুডি ওকে ভালোবেসে ফেলেছে, এমন কথা ভাবার অবকাশ ও পেয়েছে খুবই কম। আগের বছরের মে মাসটা ছিলো এমনি একটা সময়। কিন্তু সেই কানাকড়ি দামের আনন্দের বিনিময়ে আজ ও পেয়েছে গভীর সন্তোষ। ও জানে, আইরিণ ওর জীবনে হবে শুধু পটভূমিকা। কিংবা কেবল ঝকঝকে চায়ের পেয়ালার ভীড়ে একখানা হাত। তার অস্তিত্ব বোঝা যাবে ছেলেমেয়েকে ডাকাডাকি করতে শুনে। ওর জীবনে উত্তেজনার মাধুর্য আর নেই। জাদুময়ী রাত্রি, বিস্ময়ে ভরা দিনক্ষণ ও আর ফিরে পাবে না। পাতলা দুটি ঠোঁট একটুখানি বাঁকা হয়ে নেমে আসতো ওর ঠোঁটের ওপর, ও নিজেকে হারিয়ে ফেলতো মোহনীয় দুটি চোখের স্বর্গলোকে। সেসব এখন ওর কাছে অবলুপ্ত। মনের গভীরে অবশ্যি আজও স্মৃতির স্তূপ জমে আছে। তবু ও এখন যথেষ্ট শক্তিমান, যথেষ্ট সচেতন। অনাড়ম্বর মৃত্যু বরণ ওর পক্ষে আর সম্ভব নয়।

মে মাসের মাঝামাঝি দিন কতক আবহাওয়াটা থাকে মৃদু। তারপর শুরু হয়ে যায় পুরোপুরি গরম।

এই সময় একদিন রাত্তিরে ও আইরিণদের বাড়ীতে গেল। ওদের বাগদানের ব্যাপারটা সপ্তাহখানেকের মধ্যেই প্রকাশ করবার কথা। তাতে কেউ অবাকও হবে না। ওরা আজ রাত্তিরে ইউনিভার্সিটি ক্লবের লাউঞ্জে বসে ঘণ্টাখানেক নাচ দেখবে। আইরিণকে বাইরে নিয়ে গেলে ও মনে একটু বল পায়। সে দারুণ জনপ্রিয়, দারুণ মজলিসী।

বেগনী পাথরের বাড়ীটার, সিঁড়ি পেরিয়ে ভেতরে ঢুকে ও ডাক দিলো, আইরিণ।

ডাক শুনে বসবার ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন মিসেস শীয়ারার, আইরিণের ভয়ানক মাথা ধরেছে, ডেক্সটার। ও ওপরে আছে। তোমার সঙ্গে বাইরে যেতে চেয়েছিলো। কিন্তু আমি ওপরে পাঠিয়ে দিলাম। একটু ঘুমোক।

ঃ এমন কিছু নয়, আমি—

ঃ না, না। কাল সকালে তোমার সঙ্গে গল্‌ফ খেলতে যাবে। একটা রাত্তিরের জন্যে ওকে ছেড়ে দিতে পারবে না, ডেক্সটার?

মিসেস শীয়ারার মিষ্টি করে একটু হাসলেন। ডেক্সটারকে তিনি স্নেহের চোখে দেখেন। ওরও তাঁকে ভালো লাগে। ও তখখুনি উঠে পড়তে পারলো না, বসবার ঘরে গিয়ে তাঁর সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করলো।

ডেক্সটার ইউনিভার্সিটি ক্লাবেই থাকে। গোটা কয়েক কামরা নিয়ে। সেখানে ফিরে ও দরজার কাছে গিয়ে কিছুক্ষণ নাচিয়েদের দিকে চেয়ে রইলো, তারপর চৌকাঠে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে মাথা

নুইয়ে দুই-একজন পরিচিত ব্যক্তিকে অভিবাদন জানালো। এবং একবার হাই তোলা।

ঃ আরে তুমি যে লক্ষ্মীটি !

পাশ থেকে পরিচিত কণ্ঠের কথাটি শুনে ডেক্সটার চমকে উঠলো। জুডি জোন্স সঙ্গের লোকটিকে ছেড়ে ওপাশ থেকে ওর কাছে চলে এসেছে। ঝকঝকে ছিপছিপে একটি পুতুল যেন জুডি জোন্স। পরনে সোনালী রঙের পোশাক। চুলের ফিতেয় আর গাউনের জোড়ের দুটি জায়গায়ও সোনার দ্যুতি।

জুডি ওর দিকে চেয়ে হাসলো। সে যেন কেবল হাসি নয়। ডেক্সটারের মনে হল, তার ক্ষীণপ্রভ মুখখানা যেন ফুলের মতো ঝলমল করে উঠলো, ঘরের মধ্যে বয়ে গেল এক ঝলক মিষ্টি হাওয়া।

ডিনার জ্যাকেটের পকেটে ডেক্সটারের হাত দুখানা ক্ষণেকের জন্যে মুষ্টিবদ্ধ হলো। ওর সারা মুখে দেখা দিয়েছে একটা আকস্মিক উত্তেজনা। ও উদ্দেশ্যহীন প্রশ্ন করলো, কবে ফিরলে ?

ঃ বলছি। এদিকে এসো।

জুডি ঘুরে দাঁড়ালো।

সঙ্গে সঙ্গে ডেক্সটার তাকে অনুসরণ করলো।

ওর কাছ থেকে দূরে সরে গিয়েছিলো জুডি। তাকে ফিরে আসতে দেখে ও যে বিস্ময়ে কেঁদে ফেলেনি, এ এক আশ্চর্য ব্যাপার। কতো জাদুময় পথে তার পায়ের ছাপ পড়েছে ! তার ক্রিয়াকলাপ ছিলো যেন মনে আগুন ধরানো গানের মতো। সব রহস্যময় নাটকীয়তা, সব উজ্জ্বল, দ্রুতসঞ্চারী আশা তার সাথে সাথে হারিয়ে যায়। আজ আবার তারই সঙ্গে সকল কিছুই ফিরে এসেছে।

নাচঘরের দরজা পেরিয়ে জুডি ওর দিকে মুখ ফেরালো, তোমার গাড়ী আছে এখানে ? না থাকে, আমার আছে।

: আছে আমার গাড়ী।

সোনালী গাউনে খসখসে একটা আওয়াজ। জুডি এবার গাড়ীতে উঠে পড়ে। ডেক্সটার খট করে দরজাটা বন্ধ করে দেয়।

এমনি কতো ছন্দে, কতো না গাড়ীতে ওঠে জুডি ! তারপর চামড়ায় মোড়া গদিতে হেলান দিয়ে আয়েশ করে বসে, দরজার উপর হাত রেখে এমনি ভঙ্গিতে করে অপেক্ষা। জুডির নিজের কথা বাদ দিলে, আর কিছু যদি থাকতো তার গায়ে কলঙ্ক-কালিমা লেপে দেওয়ায়, তাহলে অনেক দিন আগেই কলঙ্কিত হয়ে যেতো সে। কিন্তু আজকের কথা আলাদা। আজ যেন তার আপন সত্তা ঝর্ণাধারার মতো উৎসারিত হয়ে গড়িয়ে পড়ছে।

কোনো রকমে মনটা ফিরিয়ে নিয়ে ও গাড়ীতে স্টার্ট দিয়ে রাস্তায় নেমে এলো। ও যেন ভুলে না যায়, এটা কিছুই নয়। জুডি এমন কাণ্ড আগেও করেছে এবং ও তখন জুডিকে বসিয়ে রেখেছে পেছন দিকে। এ যেন ওর খাতাপত্রের কোনো বাজে হিসেব কেটে দেওয়া।

গাড়ীখানা আস্তে আস্তে চালিয়ে ও শহরের বসতি-এলাকাটা পার হয়ে এলো। এখন ওর মুখে একটা নির্লিপ্তির ভাব।

ও এবার দোকানপাটের এলাকায় ঢুকে পড়লো।

এদিকে রাস্তাঘাট ফাঁকা। শুধু এখানে ওখানে চোখে পড়ে সিনেমার শো-ভাঙা ভীড়। কিংবা সুইমিং পুলের হলঘরটার সামনে যক্ষ্মার খপ্পরে পড়া বা বক্সিংয়ের নেশায় পাওয়া ছেলেমেয়ের জটলা। ঝলমলে কাচে-ঘেরা, নিষ্প্রভ হলদে আলো-ভরা মদের

দোকানগুলো থেকে ছিটকে আসছে পেয়ালার ঠুন ঠুন আওয়াজ আর হাত চাপড়ানির শব্দ।

জুডি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে রয়েছে। নীরবতাটা অস্বস্তিকর। কিন্তু এই সংকটের সময় নীরবতাটুকুকে দীর্ণ করবার মতো সামান্য একটা কথাও ডেক্সটার খুঁজে পাচ্ছে না।

গাড়ী ঘোরাবার একটা সুযোগ পেতেই আঁকাবাঁকা পথ ধরে ওরা ইউনিভার্সিটি ক্লাবের দিকে ফিরে চললো।

হঠাৎ জুডি প্রশ্ন করে বসলো, আমার জন্যে মন কেমন করতো না তোমার ?

: সবারই করতো।

আইরিণ শীয়াররের কথাটা জুডি শুনেছে কিনা, কে জানে। সে ফিরলো তো মাত্র কাল।

ডেক্সটার আর আইরিণের বাগ্‌দান এবং জুডির উধাও হওয়া প্রায় একই সময়ের ঘটনা।

জুডি ওর কথা শুনে হেসে উঠলো, কি যে বলো !

হাসিটায় বিষণ্ণতার সুর। কিন্তু এ-বিষণ্ণতা বাহ্যিক, মন পর্যন্ত এর মূল পৌঁছয়নি।

জুডি একবার সন্ধানী চোখে ওর দিকে তাকালো। ডেক্সটার সঙ্গে সঙ্গে ড্যাশ বোর্ড নিয়ে ব্যস্ত।

কি যেন ভাবছে জুডি। বললো, তুমি আগের চেয়ে সুন্দর হয়েছো, ডেক্সটার। তোমার চোখ দুটি যে একবার দেখবে, আর সে ভুলতে পারবে না। এমন তো কতোজনের চোখই হয় ! কিন্তু তোমার চোখের তুলনা নেই।

মন্তব্যটা শুনে ডেক্সটার হেসে ফেলতে পারতো। কিন্তু

হাসলো না। এ-ধরনের কথা ফার্স্ট ইয়ারের ছেলেদের বলা হয়ে থাকে। তবু ওর মনে একটা খোঁচা লাগলো।

জুডি সবাইকেই ডাকে 'লক্ষ্মীটি' বলে। আদরটুকুতে বেপরোয়া ব্যক্তিগত সম্পর্কের স্পর্শ দিয়ে। ডেক্সটারের উদ্দেশেও তেমনি সুরে বলে উঠলো, আমার ভয়ানক বিরক্তি ধরে গেছে। কিছুই আর ভালো লাগে না। লক্ষ্মীটি,, তুমি যদি আমায় বিয়ে করতে !

কথাটার স্পষ্টতায় ডেক্সটার বিরক্ত হল। ওর এবার বলে দেওয়া উচিত, ও অন্য একটি মেয়েকে বিয়ে করতে যাচ্ছে। কিন্তু কথাটা মুখ থেকে বেরুলো না। বিয়ের খবর দেওয়ার মতোই অনায়াসে দিব্যি করে আরো জানিয়ে দিতে পারতো, জুডিকে ও কোনো দিন ভালোবাসেনি। কিন্তু একথাটাও ও বলতে পারলো না।

জুডি আগের মতো সুরেই বলে যেতে লাগলো, আমার মনে হয়, আমাদের অসুবিধা হবে না। অবশ্যি, তুমি যদি আমায় ভুলে গিয়ে আর কাউকে ভালোবেসে না থাকো।

তার বিশ্বাসটা নিঃসন্দেহে গভীর। সে কার্যতঃ বলেই দিয়েছে, ডেক্সটার তাকে ভুলে গিয়ে অন্য কোনো মেয়েকে ভালো বাসবে, এটা বিশ্বাস করা অসম্ভব। ডেক্সটারের দিক থেকে তেমন কিছু যদি ঘটেও থাকে, তাহলে সেটা নেহাৎই ছেলে-মানুষী চাপল্যের ফল। এবং সম্ভবতঃ বাহাদুরি দেখাবার লোভে করা। তাই, এর কোনো গুরুত্বই নেই। এটা সহজেই মুছে ফেলা যায়। সুতরাং জুডি ওকে ক্ষমা করতে পারবে।

জুডি আবার বললো, তুমি অবশ্যি আমাকে ছাড়া আর

কাউকে ভালোবাসতে পারোনি। আমার জন্যে তোমার এই ভালোবাসার ধরনটা আমার বেশ লাগে। তোমার কি গত বছরের কথাগুলো মনে আছে, ডেক্সটার ?

: হ্যাঁ, আছে।

: আমারও।

জুডির মনে কি সত্যিই দোলা লেগেছে ? নাকি, সে নিজের অভিনয়ের দোলায় দুলছে ?

: আবার যদি আমরা গত বছরের মতো হতে পারতাম।

ডেক্সটার এবার মনের সঙ্গে লড়াই করে উত্তর দিলো, তা বোধ হয় আমরা আর পারবো না।

: হ্যাঁ শুনছি, তুমি আইরিণ শীয়ারারকে নিয়ে ভয়ানক মেতে উঠেছো।

নামটার ওপর সামান্যতমো জোরও জুডি দেয়নি। তবু ডেক্সটার হঠাৎ লজ্জা পেয়ে গেল।

জুডি আকস্মিকভাবে বলে উঠলো, আমায় বাড়ী নিয়ে চলো। ওই বিচ্ছিরি নাচে আর যেতে চাইনে। যতো সব ছেলেমানুষ।

ডেক্সটার গাড়ীখানা বসতি এলাকার পথের দিকে ঘোরালো।

সঙ্গে সঙ্গে জুডি নিঃশব্দে কাঁদতে শুরু করলো। ও জুডিকে আর কখনো কাঁদতে দেখেনি।

ক্রমে অন্ধকার পথে আলোর আভাস দেখা দিলো। বসতি এলাকা এগিয়ে আসছে। পথের দু'পাশে দাঁড়িয়ে আছে শহরের ধনী লোকদের বাড়ী।

ডেক্সটারের গাড়ীখানা মর্টিমার জোন্সের বিরাট সাদা রঙের বাড়ীটার সামনে এসে থেমে গেল।

জমকালো ধরনের কাজ করা বাড়ী। ঘুম-জড়ানো গায়ে ভেজা-ভেজা জোছন'র উজ্জ্বল আভা। আর, কি নিরেট বাড়ী! ডেক্সটার রীতিমত চমকে উঠলো। মজবুত দেয়াল, ইস্পাতের কড়িকাঠ, ছাদ-বরগার চোখ-ধাঁধানো প্রসার, —সব কিছুই যেন ওর পাশে বসা সুন্দরী মেয়েটির একেবারে বিপরীত। কিন্তু বাড়ীটার দৃঢ় পটভূমিতে জুডির ক্ষীণ দেহলতা যেন আ'রো প্রখর হয়ে উঠছে। যেন দেখিয়ে দিতে চাইছে, প্রজাপতির পাখাও হাওয়'র দোলা জাগাতে পারে।

ডেক্সটারের সারা দেহমনে একটা উন্মত্ত কলরব জেগে উঠেছে। কিন্তু ও একেবারে নিশ্চুপ হয়ে বসে রইলো। ওর মনে দেখা দিয়েছে একটা ভয়ও। ও যদি একটুও নড়াচড়া করে, জুডিকে দু'বাহুর বেষ্টনীতে টেনে নেয়ার লোভ সামলানো হয়ে পড়বে অসম্ভব।

জুডির ভেজা গাল বেয়ে দু'ফোঁটা পানি গড়িয়ে পড়ে ওপরের ঠোঁটের গায়ে এসে কাঁপছে। সে ভাঙা গলায় বললো, আমার মতো সুন্দরী মেয়ে আর কে আছে? তাহলে আমি সুখী হতে পারবো না কেন?

তার ভেজা চোখ দুটি ডেক্সটারের সমস্ত দৃঢ়তা গুঁড়িয়ে ধুলো করে দিচ্ছে। ঠোঁট দুটি ধীরে ধীরে নীচের দিকে বাঁক নিলো। কমনীয় এক বিষণ্ণতা গায়ে জড়িয়ে।

জুডি আবার বলতে লাগলো, তুমি যদি রাজী থাকো, আমি তোমায় বিয়ে করবো, ডেক্সটার। তুমি হয়তো ভাবছো, আমি অযোগ্য। কিন্তু না, ডেক্সটার, তোমার জীবনে আমি আদৌ বেমানান হবো না।

ক্রোধ, গর্ব, কামনা, ঘৃণা আর স্নেহের সহস্র কথা ভীড় করে ওর বুক ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। তারপর আবেগের এক নিটোল তরঙ্গে ও যেন নেয়ে উঠলো। একেবারে অবগাহনের মতো করে। সঙ্গে সঙ্গে ওর মনের ওপর থেকে যেন বিবেক, লোকাচার, সন্দেহ আর সম্মানবোধ,—সমস্ত কিছুর পর্দা সরে গেল। ওর পাশে বসে কথা বলছে কে? এই তো ওর কাঙ্ক্ষিতা। একান্তই ওর। এবং ওরই স্বপ্নলোকের রূপবতী, ওরই গরবের ধন।

জুডির একটা সশব্দ নিশ্বাস। সঙ্গে সঙ্গে ও শুনতে পেলো, ভেতরে আসবে না?

তারপর খানিকটা অপেক্ষা।

ডেক্সটার কম্পিত গলায় উত্তর দিলো, আচ্ছা, চলো।

শুনলে অবাক হতে হয়, ব্যাপারটা যখন চুকে যায়—কিংবা তার পরেও কোনো সময় ও ওই রাতটির ঘটনাগুলোর জন্যে আফসোস করেনি। দশ বছর পরে পেছন ফিরে তাকিয়ে ও যখন দেখেছে, জুডির নতুন উচ্ছ্বাসটা টিকে ছিলো মাত্র এক মাস, তখনও ভেবেছে, এ একটা তুচ্ছ ব্যাপার। ওর আত্মসমর্পণ পরিণামে ওর মানসিক যন্ত্রণা তীব্রতরো করে এবং আইরিণ শীয়ারারের আর তার বাবা-মা—যাঁরা ছিলেন ওর শুভাকাঙ্ক্ষী,—তাঁদের মনে দেয় গভীর আঘাত। এসবেরও কোনো গুরুত্বই ওর কাছে নেই। আইরিণের দুঃখটাও ওর কাছে মনে দাগ কেটে যাওয়ার মতো স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারেনি।

ডেক্সটার ভেতরে ভেতরে মনটা শক্ত করে ফেলছিলো। ওর

কাণ্ড দেখে শহরের লোকেরা কি ভাবছে, তা নিয়ে ও মাথা ঘামায়নি। তার কারণ অবশ্যি এই নয় যে, ও তখন শহর ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্যে পোঁটলাপুঁটলি বাঁধছে। ওর বরং মনে হয়েছে, ব্যাপারটায় অন্যদের প্রতিক্রিয়া কৃত্রিম। অন্যের মতামতের পরোয়া ও তাই আদৌ করেনি। তারপর ও দেখেছে, ওসব একেবারেই নিষ্প্রয়োজন। আসলে, আপন খুশিমাফিক চলবার কিংবা জুডি জোন্সকে আটকে রাখবার ক্ষমতা ওর কোনো দিনই ছিলো না।

কিন্তু একথা ও যখন বুঝতে পেরেছে, তখন ওর মনে জুডির প্রতি কোনো আক্রোশও জমে ওঠেনি। জুডিকে ও ভালোবাসতো। এবং যতো দিন ওর ভালোবাসবার বয়েস থাকবে, ও এই প্রেম অক্ষুণ্ণ রাখবে। কিন্তু জুডিকে পাওয়া সম্ভব নয়। ও তাই সহ্য করেছে এক গভীর বেদনা,—যে-বেদনা সইতে পারে শুধু শক্তিমান মন। একদিন ও ক্ষণেকের তরে পেয়েছিলো এক গভীর আনন্দের স্বাদ। সেই আনন্দের জ্বালার মতোই তীব্র জুডিকে না-পাওয়ার বেদনা।

জুডি যেসব কারণ দেখিয়ে বিয়ের কথাটা উলটে ফেলে, সেগুলো আসলে মিথ্যে। সে বলেছিলো আইরিণের কাছ থেকে সে ওকে ছিনিয়ে নিতে চায় না। অথচ ডেক্সটার জানে, শুধু ওইটুকুই তখন জুডির কাম্য। কিন্তু তার মিথ্যে যুক্তিও ওকে বিদ্রোহী করে তুলতে পারেনি। ও ছিলো সকল ভাববিভ্রম, সকল কৌতুকর নাগালের বাইরে।

ফেব্রুয়ারি মাসে ও পূব অঞ্চলে গিয়ে ওঠে। ইচ্ছে ছিলো, লণ্ড্রিগুলো বিক্রি করে দিয়ে নিউইয়র্কেই থেকে যাবে। কিন্তু মার্চ মাসে আমেরিকায় যুদ্ধের হাওয়া লাগে। তখন ওর সব

পরিকল্পনা পালটে ফেলতে হয়। ও পশ্চিম অঞ্চলে ফিরে আসে।

তারপর কারবারের ভার পার্টনারের হাতে ছেড়ে দিয়ে এপ্রিলের শেষ দিকে ও চলে যায় অফিসারদের প্রথম প্রশিক্ষণ শিবিরে। হাজার হাজার তরুণ সেদিন একটুখানি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে যুদ্ধকে স্বাগতম জানায়। যুদ্ধের ভেতর তারা খুঁজেছিলো জটিল ভাবাবেগের আবর্ত থেকে মুক্তির পথ। ডেক্সটার হয় তাদেরই সঙ্গী।

মনে রাখা দরকার, এ-কাহিনী ডেক্সটারের জীবনী নয়। অবশ্যি, এর ভেতর এমন অনেক কথাই এসে পড়েছে, যেগুলির সাথে ওর অল্প বয়েসের স্বপ্নগুলোর কোনো সম্পর্কই নেই। সেসব—এবং ডেক্সটারের কথাও—ফুরিয়ে এলো। এখানে বলা দরকার শুধু আর একটি ঘটনার কথা।

এটি ঘটে আরো সাত বছর পরে। অকুস্থল নিউইয়র্ক।

সেখানে ওর জীবন সাফল্যে ভরে উঠেছে। এতো সুন্দর-ভাবে যে, ওর কাছে এখন কোনো বাধাই অলঙ্ঘ্য নয়। ওর বয়েস এখন বত্রিশ। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর পরই ও একবার প্লেনে চেপে পশ্চিম অঞ্চলে গিয়েছিলো। সাত বছরের মধ্যে এই-ই প্রথম—এবং শেষবার—ওদিকে যাওয়া।

তারপর একদিন ডেট্রয়েট থেকে ডেভলিন নামে এক ভদ্র-লোক এলেন ওর অফিসে। ব্যবসা সংক্রান্ত একটা কাজে ওর সঙ্গে দেখা করতে।

এবং তখখুনি, ওই অফিসের মধ্যেই, ব্যাপারটা ঘটে যায়। আর, বলতে গেলে সেই সঙ্গেই ডেক্সটারের জীবনের এই বিশেষ

দিকটির ওপর একটা পর্দা নেমে আসে।

ডেভলিন লক্ষ্যহীন কৌতূহলে বললেন, আপনি তাহলে মধ্য-পশ্চিম অঞ্চলের লোক! মজার ব্যাপার তো! আমার ধারণা ছিলো, আপনার মতো লোকদের জন্ম-মৃত্যু সবই হয়তো ওয়াল স্ট্রীটেই হয়ে থাকে। জানেন, ডেট্রয়েটে আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর স্ত্রী আপনাদের শহরের মেয়ে। বিয়ের সময় তাঁদের গীর্জায় নিয়ে যাওয়ার ভার আমার ওপরেই ছিলো।

এর পর যে কি ঘটবে, ডেক্সটার তা জানে না। ও শান্ত মনে গল্পটা শোনার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলো।

ডেভলিনের গলায় বিশেষ কোনো আগ্রহের সুর নেই, ভদ্রমহিলার নাম জুডি সিম্‌স্‌। তিনি আগে ছিলেন জুডি জোন্স।

ঃ হ্যাঁ, আমি চিনি তাঁকে।

একটা অস্পষ্ট অস্থিরতায় ঘিরে ধরে ওকে। ও অবশ্যি আগেই শুনেছিলো, জুডির বিয়ে হয়ে গেছে। এবং সম্ভবতঃ ইচ্ছে করেই আর কিছু শোনেনি।

ডেভলিন কি যেন ভাবছেন। অর্থহীন সুরে বললেন, ভারী চমৎকার মেয়ে। ওঁর জন্যে আমার বরং একটু দুঃখই হয়।

এক মুহূর্তে ডেক্সটারের মধ্যে কি যেন একটা সজাগ, উৎকর্ণ হয়ে উঠলো, কেন?

ঃ সে আর বলবেন না। এক দিক থেকে দেখতে গেলে, লুড সিম্‌স্‌ গুঁড়ো হয়ে গেছেন। তিনি যে স্ত্রীর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেন, তা আমি বলছিনে। তবে, তিনি বড্ডো বেশী মদ খান আর বাইরে ঘোরাঘুরি করেন।

: জুডি সিম্‌স্‌ বাইরে ঘোরাঘুরি করেন না ?

: না। বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে বাড়ীতেই থাকেন।

: ও।

ডেভলিন বললেন, লুড সিম্‌সের জন্যে ওঁর বয়েসটা একটু বেশী।

: বেশী ! বলছেন কি, সাহেব ? ওঁর বয়েস তো মাত্র সাতাশ।

ডেক্সটারের মাথায় যেন এক খেয়ালী ভূত চেপে বসেছে। ওর প্রচণ্ড ইচ্ছে হতে লাগলো, ঘর থেকে এক ছুটে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। তারপর ট্রেন ধরে ডেট্রয়েট চলে যায়। হঠাৎ ও চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো।

ডেভলিন সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমা প্রার্থনার সুরে বলে উঠলেন, আপনি বোধ হয় ব্যস্ত আছেন। আমি বুঝতে পারিনি—

ডেক্সটার নিজেকে সামলে নিয়ে শান্ত গলায় বললো, না, না, ব্যস্ত নই। আমার হাতে আদৌ কোনো কাজ নেই। আপনি বলছিলেন, ওঁর বয়েস—সাতাশ ? না, আমি বলছিলাম।

ডেভলিন শুকনো গলায় উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, আপনি।

: তাহলে বলে যান। থামবেন না।

: মানে ?

: জুডি জোন্সের কথা।

ডেভলিন অসহায় চোখ তুলে ওর দিকে তাকালেন, ইয়ে, মানে—যা বলবার ছিলো, সবই তো বললাম। লুড ওঁর সঙ্গে বড্ডো খারাপ ব্যবহার করেন। তবে, তালাক-টালাকের ভয় নেই। লুড খুব বেশী বাড়াবাড়ি করলেও জুডি তাঁকে ক্ষমা করে দেন।

আসলে আমার কেন জানি মনে হয়, উনি স্বামীকে ভালোবাসেন না। উনি যখন প্রথম ডেট্রয়েটে আসেন, তখন বেশ সুশ্রী মেয়ে ছিলেন।

বেশ সুশ্রী মেয়ে ছিলেন! কথাটা ডেক্সটারের কাছে হাস্যকর মনে হল, কেন, উনি কি—এখন আর সুশ্রী নন?

: উনি ঠিকই আছেন।

ডেক্সটার হঠাৎ বসে পড়লো, ইয়ে—আমি আপনার কথাগুলো বুঝতে পারছিনে। আপনি একবার বললেন, উনি ছিলেন সুশ্রী মেয়ে। আবার, এখন বলছেন, ঠিকই আছেন। আপনার আসল বক্তব্য কি, আমি বুঝতে পারছিনে। জুডি জোন্স আদৌ 'সুশ্রী মেয়ে' ছিলেন না, উনি ছিলেন উঁচু দরের সুন্দরী। আমি তো ওঁকে চিনতাম। উনি ছিলেন—

ডেভলিন মিষ্টি করে একটুখানি হাসলেন, আমি কিন্তু আপনার সঙ্গে তর্ক বাধানোর চেষ্টা করছিনে। আমার মনে হয়, জুডি চমৎকার মেয়ে। ওঁকে ভালোও লাগে। ওঁর মতো মানুষ কি করে যে লুডের জন্যে একেবারে পাগল হয়ে উঠেছিলেন, আমি বুঝতে পারিনে। অথচ ব্যাপারটা সত্যি।

তিনি একটুখানি থামলেন, তারপর আগের কথাগুলোর সঙ্গে জুড়ি দিলেন, অবশ্যি, অধিকাংশ মেয়েছেলেই ওঁর মতন।

ডেক্সটার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালো। ওর মনের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে বেয়াড়া কথা। ডেভলিনের কথাগুলোর পেছনে নিশ্চয়ই একটা যুক্তি আছে। হয়তো লোকটি একটু অনুভূতিহীন। কিংবা হয়তো মনের মধ্যে রয়েছে একটা গোপন আক্রোশ।

ডেভলিন আঙুল মটকাতে মটকাতে বললেন, অনেক

মেয়েই ঠিক এমনি করে চুপসে যায়। আপনি নিশ্চয়ই এসব দেখেছেন। বিয়ের সময় উনি কতোটা সুশ্রী ছিলেন, এখন হয়তো আমার তা মনেই পড়বে না। বুঝলেন কিনা, বিয়ের পর আমি ওঁকে বহুবার দেখেছি। ওঁর চোখ দুটি ভারী সুন্দর।

ডেক্সটারের মনটা কেমন জানি চুপসে এলো। জীবনে এই প্রথম ওর মনে হচ্ছে, ও যেন মদের নেশায় চুর হয়ে আছে। ডেভলিনের একটা কথায় ও গলা ছেড়ে হাসছিলো। কিন্তু কথাটা যে কী—কিংবা সেটা শুনে কেন ওর হাসি পেয়েছে, তা ও জানে না।

মিনিট কয়েক পরই ডেভলিন চলে গেলেন।

এবার ও লাউঞ্জে গিয়ে গা এলিয়ে দিলো। চোখ দুটো জানলা দিয়ে আকাশসীমায়। দিনের সূর্য তখন কমনীয় ম্লান লাল-সোনালী তরঙ্গে ডুবে যাচ্ছে।

ও ভেবেছিলো, ওর যখন হারানোর আর কিছুই নেই, কোনো আঘাতই এখন ওকে ব্যথা দিতে পারবে না। কিন্তু এবার ওর মনে হয়, এইমাত্র ও আরো কিছু হারিয়েছে। ঠিক যেন ও জুডি জোন্সকে বিয়ে করলো এবং তারপর সে ধীরে ধীরে ওর চোখের সামনে থেকে মিলিয়ে গেল।

ওর স্বপ্ন আর নেই। কে যেন ওর কাছ থেকে কি একটা জিনিষ ছিনিয়ে নিয়েছে। সংজ্ঞাহীন এক আতঙ্কে ও চোখ দুটি হাতের তালু দিয়ে চেপে ধরে। তারপর শুরু হয় এক প্রাণান্তকর চেষ্টা। শেরী দ্বীপের উপকূলে হ্রদের জলের আছড়ানি, জুডির বাসার জোছনা-ভরা বারান্দা, গল্‌ফ ময়দানের ডোরাকাটা নিশান আর ঝরঝরে রোদ, জুডির নরম সোনালী গ্রীবাবক্রিমা,—সব কিছুর

ছবিই ও ফিরিয়ে আনবে হাতে ঢাকা চোখ দুটির সামনে। ফিরিয়ে আনবে ওর চুমোয় চুমোয় ভিজে-ওঠা জুঁইর ঠোঁট দুটি, বিষণ্ণ মিনতি-ভরা তার চোখ জোড়া, তার ভোরবেলাকার মিহি রেশমের মতো ঝলমলে রূপ। শুধুই ছবি। ওসব জিনিষ জগতের আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। একদিন তারা ছিলো বাস্তব, কিন্তু আজ আর তাদের কোনো অস্তিত্ব নেই।

বহুদিন পর এই প্রথম ওর গাল বেয়ে অশ্রুর ধারা নামলো। কিন্তু আজকের এ-কান্না ওর নিজের জন্যে। কোনো ঠোঁট, কোনো চোখ, কোনো লাস্যময় হাতের জন্যে ও লালায়িত নয়। ও চায় ভালোবাসতে। কিন্তু ভালোবাসা ওর পক্ষে অসম্ভব। কেননা, ভালোবাসার জগৎ থেকে ও সরে এসেছে এবং সেখানে আর কোনো দিন ফিরে যেতে পারবে না। সেখানকার সব দরজা বন্ধ হয়ে গেছে, সূর্য চিরতরে অস্তমিত হয়েছে। কালজয়ী ইস্পাতের ধূসর সৌন্দর্য ছাড়া আর কোনো সৌন্দর্যও নেই। এমনকি, যে-দুঃখের ভার ও মুখ বুজে সইতে পারতো, তাও ফেলে এসেছে সেই মায়াময় যৌবনময় সমৃদ্ধ জীবনের দেশে। যে-দেশ ওর শীতের স্বপ্নগুলির জন্মভূমি।

এবার ও মনে মনে আওড়াতে লাগলো, অনে-ক দিন, অনে-ক দিন আগে আমার মধ্যে কি যেন একটা ছিলো। কিন্তু আজ আর নেই। আজ তা হারিয়ে গেছে, আজ তা অস্তিত্বহীন। আমি কাঁদতে পারিনে, ভালোবাসতেও পারিনে। সে-জিনিষ আর ফিরে আসবে না।

জেমস জয়েস

কানাগলি

নর্থ রিচমণ্ড স্ট্রীট কানাগলি। এখানে তাই কোনো হৈ চৈ নেই। শুধু একটি সময় ছাড়া। যখন ক্রিশ্চিয়ান ব্রাদার্স' স্কুলের ছেলে-গুলো ছাড়া পায়। গলির বন্ধ মাথায় চৌকো একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে একটি খালি দোতলা বাড়ী। আশপাশের কোনো কিছুর সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই। অন্য বাড়ীগুলোয় ভদ্র শ্রেণীর লোকের বাস। এবং বাড়ীগুলো যেন এ-ব্যাপারে সচে-তন। তারা অপলক চোখে এ ওর শান্ত, বাদামী মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

আমাদের বাড়ীটায় আগে ভাড়াটে ছিলেন একজন পুরুত। তিনি পেছন দিকের ড্রয়িংরুমে মারা যান। তারপর অনেক দিন এ-বাড়ীর দরজা-জানলা ছিলো বন্ধ। তার ফলে প্রত্যেকটি কাম-রার বাতাস হয়ে যায় দুর্গন্ধ। রান্নাঘরের পেছন দিকের একটি কামরা ছিলো আজেবাজে জিনিষ রাখবার জায়গা। সেটা পুরোণো অকেজো কাগজপত্রে ভরা। সেখানে আমি খানকয়েক কাগজে

বাধাই বই পেয়েছিলাম। সবগুলোরই পাতা কোঁচকানো এবং ভিজে-ভিজে। বইগুলোর মধ্যে ছিলো ওয়াল্টার স্কটের 'দ্য এ্যাবট'। এছাড়া, 'দ্য ডিভাউট কম্যুনিক্যান্ট' আর 'দ্য মেমোয়ার্স অব ভিডক'। আমার সবচেয়ে ভালো লাগতো শেষের বইখানা। এর পাতাগুলো হলদে হয়ে গিয়েছিলো বলে।

বাড়ীর পেছন দিকে জংলা বাগানটার মাঝখানটিতে একটা আপেল গাছ। আর আছে যেখানে সেখানে গজিয়ে ওঠা কিছু ঝোপ। এমনি একঝোপের তলায় আমি পেয়েছিলাম সাইকেলের একটা মরচে-ধরা পাম্প। সেই পুরুত ভাড়াটের। তিনি একেবারে হাতেম তাই গোছের দাতা ছিলেন। তিনি তাঁর সমস্ত টাকা-পয়সা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে এবং বাড়ীর আসবাবপত্র তাঁর বোনকে উইল করে দিয়ে যান।

শীতের ছোটো দিন যখন আসে, আমাদের ডিনার শেষ হওয়ার আগেই সন্ধ্যা নামে। যখন রাস্তায় বেরোই, বাড়ী-গুলোকে বিষণ্ণ দেখায়। মাথার ওপরকার আকাশটুকু হয় বেগনী। যে-রঙ সব সময় পাল্টাতে থাকে। রাস্তার বাতিগুলো তার দিকে দুর্বল শিখা তুলে ধরে। হিমেল হাওয়াটা সূচের মতো গায়ে বেঁধে। তবু আমরা খেলা করি। যতোক্ষণ না গা ঘামে ভিজে চকচকে দেখায়। আমাদের চেঁচামেচি গলিতে প্রতিধ্বনি তুলে ফেরে।

বাড়ীগুলোর পেছন দিকের কাদাভরা পথে আমাদের টেনে এনেছে খেলাধুলোর জীবন। কুঁড়েঘর থেকে আসা দস্যিদল এখানে ছুটোছুটি করে। অন্ধকার পানি-চোঁয়ানো বাগানগুলোর খিড়কি দরজায়ও আমাদের আনাগোনা নিয়মিত। সেখানে ছাই-গাদা থেকে বিচ্ছিরি গন্ধ ওঠে। আমরা হানা দিই অন্ধকার,

বাধাই বই পেয়েছিলাম। সবগুলোরই পাতা কোঁচকানো এবং ভিজে-ভিজে। বইগুলোর মধ্যে ছিলো ওয়াল্টার স্কটের 'দ্য এ্যাবট'। এছাড়া, 'দ্য ডিভাউট কম্যুনিক্যান্ট' আর 'দ্য মেমোয়ার্স অব ভিডক'। আমার সবচেয়ে ভালো লাগতো শেষের বইখানা। এর পাতাগুলো হলদে হয়ে গিয়েছিলো বলে।

বাড়ীর পেছন দিকে জংলা বাগানটার মাঝখানটিতে একটা আপেল গাছ। আর আছে যেখানে সেখানে গজিয়ে ওঠা কিছু ঝোপ। এমনি একঝোপের তলায় আমি পেয়েছিলাম সাইকেলের একটা মরচে-ধরা পাম্প। সেই পুরুত ভাড়াটের। তিনি একেবারে হাতেম তাই গোছের দাতা ছিলেন। তিনি তাঁর সমস্ত টাকা-পয়সা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে এবং বাড়ীর আসবাবপত্র তাঁর বোনকে উইল করে দিয়ে যান।

শীতের ছোটো দিন যখন আসে, আমাদের ডিনার শেষ হওয়ার আগেই সন্ধ্যা নামে। যখন রাস্তায় বেরোই, বাড়ী-গুলোকে বিষণ্ণ দেখায়। মাথার ওপরকার আকাশটুকু হয় বেগনী। যে-রঙ সব সময় পাল্টাতে থাকে। রাস্তার বাতিগুলো তার দিকে দুর্বল শিখা তুলে ধরে। হিমেল হাওয়াটা সূচের মতো গায়ে বেঁধে। তবু আমরা খেলা করি। যতোক্ষণ না গা ঘামে ভিজে চকচকে দেখায়। আমাদের চেঁচামেচি গলিতে প্রতিধ্বনি তুলে ফেরে।

বাড়ীগুলোর পেছন দিকের কাদাভরা পথে আমাদের টেনে এনেছে খেলাধুলোর জীবন। কুঁড়েঘর থেকে আসা দস্যিদল এখানে ছুটোছুটি করে। অন্ধকার পানি-চোঁয়ানো বাগানগুলোর খিড়কি দরজায়ও আমাদের আনাগোনা নিয়মিত। সেখানে ছাই-গাদা থেকে বিচ্ছিরি গন্ধ ওঠে। আমরা হানা দিই অন্ধকার,

দুর্গন্ধে-ভরা আস্তানাগুলোতেও, যেখানে কোচম্যানরা ঘোড়ার গায়ে চিরুনি চালায় এবং হাত বুলিয়ে লোমগুলো সমান করে দেয়, নয়তো বকলেস আঁটা লাগাম টেনে টুংটাং আওয়াজ তোলে।

আমরা যখন এঁদো গলি থেকে বড়ো রাস্তায় ফিরে আসি, ততোক্ষণে রান্নাঘরের জানলার আলোয় এলাকাটা ভরে যায়। মোড়ে চাচাকে দেখলে আমরা ছায়ায় গা ঢাকা দিই! তারপর নিরাপদে সেইখানেই দাঁড়িয়ে থাকা। যতোক্ষণ তিনি বাড়ীতে গিয়ে না ঢোকেন। মাঝে মাঝে ম্যাঙ্গানের বোনকে ওদের বাড়ীর দোরগোড়ায় দেখা যায়। সে ম্যাঙ্গানকে চা খেতে ডাকে। রাস্তার এ-মাথা থেকে ও-মাথা তক চোখ ফেলে ম্যাঙ্গানকে খুঁজতে থাকে। এসবও আমরা ছায়াঢাকা জায়গাটিতে দাঁড়িয়ে থেকেই দেখি। তখন একটু অপেক্ষাও করতে হয়। সে বাইরেই রয়ে গেল, না, ভেতরে চলে যাচ্ছে, সেটা দেখবার জন্যে। যদি বাইরেই থাকে, আমরা হাল ছেড়ে দিয়ে ম্যাঙ্গানদের বাড়ীর পৈঠার দিকে এগিয়ে যাই। এবং গিয়ে দেখি, সেও আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে। আধাখোলা দরজা দিয়ে ছিটকে আসা আলো গায়ে মেখে। তার ভাই তাকে কিছুক্ষণ না জ্বালিয়ে ভেতর ঢোকে না। এটা তার নিত্যকার অভ্যাস। আমি রেলিংয়ের পাশে দাঁড়িয়ে তার দিকে চেয়ে থাকি। সে একটু নড়লেই তার গাউনটা দোল খায়। চুলের নরম দশিটা একবার ডাইনে, একবার বাম দিকে ছুটে বেড়ায়।

সকালবেলা আমি সামনের বৈঠকখানার মেঝেয় গা এলিয়ে তার দিকে চেয়ে থাকি। এটা হচ্ছে আমার নিত্যকার কাজ। পর্দাটা তখন নামানো থাকে। শুধু চোকাঠের কাছে ইঞ্চিখানেক ফাঁক রেখে। যাতে বাইরে থেকে আমাকে কেউ দেখতে না পায়।

সেযখন পৈঠার কাছে আসে, আমার বুকখানা লাফাতে শুরু করে। আমি তখন এক ছুটে হলঘরে চলে যাই। সেখান থেকে আমার বইগুলোছোঁ মেরে তুলে নিই। তারপর তার পিছু নেয়া। সারাক্ষণ তার তামাটে শরীরটার দিকে চোখ রেখে। একটা মোড়ে গিয়ে আমাদের দুজনের পথ দু'দিকে বাঁক নেবে। তার কাছাকাছি আসতেই আমি তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে তাঁকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাই।

এটা ঘটে প্রত্যেক দিন সকালবেলা। দিনের পর দিন। আমি কখনো তার সাথে কথা বলিনি। হঠাৎ দু'চারটে শব্দ উচ্চারণ করা ছাড়া। তবু তার নামটা যেন আমার নির্বোধ রক্তের প্রতিটি বিন্দুকে টেনে রাখে। একটা সমনের মতো। তার ছায়ামূর্তি আমার সাথে সাথে ফেরে। এমনকি, যেসব জায়গা ভালোবাসাটাসার মেজাজ একদম ধোঁয়া করে দেয়, সেখানে তক।

শনিবার সন্ধ্যায় চাচীমা কেনাকাটায় বেরোন। তখন আমাকে সঙ্গে যেতে হয়। দু'চারটে প্যাকেট হাতে নিয়ে সাহায্য করি। আমরা বাজারে যাই হেঁটে। আলো-ঝলমল পথ দিয়ে। মাতাল আর দর-কষাকষি-করা মহিলাদের কনুইয়ের গুঁতো খেতে খেতে। চারপাশ থেকে কানে আসে মজুরদের বিচ্ছিরি গালাগালি। শুয়োরের মাংসের গামলার পাশে পাহারায় দাঁড়িয়ে-থাকা দোকানের হোঁড়াগুলো কর্কশ গলায় মুখস্থ বুলি আউড়ে খদ্দের ডাকে। পথের গাইয়েরা নাকী সুরে গান গায়। কখনো ও'ডোনোভান রোসাকে নিয়ে বাঁধা 'শোনো শোনো সবাই শোনো' গোছের গান, কখনো আমাদের দেশের হাঙ্গামা-টাঙ্গামা নিয়ে লেখা কোনো গাথা। এই সব হল্লা আর চীৎকার মিলে মিশে এক হয়ে গিয়ে আমার

মনের ভেতর জীবনের শুধুমাত্র একটি অনুভূতি জাগায়। আমি তখন কল্পনা করি, আমার চারদিকে শত্রুর ভীড়। কিন্তু তারই ভেতর দিয়ে আমি নিরাপদে যীশুর শেষ নৈশভোজের পাত্র বয়ে নিয়ে চলেছি।

মাঝে মাঝে অদ্ভুত সব প্রার্থনায় আর প্রশংসাগাথায় তার নাম আমার ঠোঁটের পাশে নাচানাচি করে। সেসব প্রার্থনা বা কথার অর্থ আমি নিজেই বুঝিনে। আমার চোখ দুটি প্রায়ই পানিতে ভরে ওঠে। কেন, তাও আমি জানিনে। আবার, মাঝে মাঝে মনে হয় হৃৎপিণ্ড থেকে কি যেন একটা ছিটকে বেরিয়ে বুকের ভেতরটা ভাসিয়ে দিচ্ছে।

ভবিষ্যতের কথা আমি বড়ো একটা ভাবিনে। তার সাথে আমি কোনো দিন কথা বলতে পারবো কিনা, পারলেও কিভাবে তাকে আমার জটপাকানো ভক্তির কথা জানাবো, আমি তা বুঝিনে। কিন্তু আমার শরীরটা যেন এক বীণা। আর, তার কথা এবং ভাবভঙ্গি আঙুলের মতো সেই বীণার তারগুলির ওপর খেলা করে বেড়ায়।

একদিন সন্ধ্যেবেলা আমি পেছন দিকের ড্রয়িং রুমটিতে গিয়ে ঢুকি। যেখানে পুরুত সাহেব মারা গিয়েছিলেন। সন্ধ্যেটা বাদলার দরুন অন্ধকার। বাড়ীতে কোথাও একটা শব্দ নেই। জানলার একটা ভাঙা কাচের ফোকল গলে বৃষ্টির রিমঝিম শব্দ কানে আসে। সূচের সূক্ষ্ম ডগার মতো বৃষ্টির কণাগুলো যেন ভিজে মাটির বুকে একটানা খেলা করে চলেছে। আমার থেকে নীচের দিকে দুরের একটা আলো অথবা কাচওয়ালা জানলার ঝলমলানি।

আমার ভাগ্য ভালো, আমি খুব সামান্য জিনিষ দেখতে পাচ্ছি। আমার সমস্ত অনুভূতি যেন চায় গা ঢাকা দিয়ে থাকতে। একবার মনে হয়, আমি যেন তাদের কাছ থেকে সরে যাচ্ছি। সঙ্গে সঙ্গে হাতের তালু দুটো জোরে জোড়া করে ফেলি। এতো জোরে যে, শেষ পর্যন্ত হাত দুখানা কেঁপে ওঠে। তালু থেকে বারবার মৃদু গুঞ্জন উঠতে থাকে, আমার প্রেয়সী, আমার প্রেয়সী!

অবশেষে সে আমার সাথে কথা বলে।

তার প্রথম কথাগুলো শুনে আমি একেবারে ভ্যাবাচাকা খেয়ে যাই। কি জবাব দেব, ভেবে পাইনে।

সে আমাকে জিজ্ঞেস করে, তুমি কি আজ এ্যারাবি যাবে?

আমি তাঁকে 'হ্যাঁ' বলেছিলাম, না, 'না', আজ আর মনে নেই।

সে আবার বলে, চমৎকার বাজার। একবার যেতে পারলে খুশী হতাম।

এবার আমি শুধাই, যেতে পারবেন না কেন?

কথা বলবার সময় সে হাতের একটা রূপোর চুড়ি ক্রমাগত ঘুরিয়ে চলেছিলো। আমার প্রশ্নের জবাবে বলে, না, যেতে পারবো না। এ-সপ্তাহে আমাদের কনভেন্টে একটা চেল্লায় বসবার অনুষ্ঠান আছে।

তার ভাই আর অন্য দুটি ছেলে তাদের টুপি নিয়ে টানা-টানি করছে। রেলিংয়ের কাছে আমি একাই দাঁড়িয়ে আছি। সে একটা খোঁটার মাথা ধরে রেখেছে। মাথাটা আমার দিকে

নুইয়ে দাঁড়িয়ে। আমাদের দরজার বিপরীত দিকের বাতি থেকে তার গলার সাদা বাঁকটিতে আলো ঠিকরে পড়ছে। ঘাড়ের ওপর ছড়ানো চুলগুলো ঝলমলে। খানিকটা আলো তার রেলিংয়ের ওপর রাখা হাতখানাতেও গড়িয়ে পড়ছে। আলো তার গাউনের এক পাশেও। সে সহজ এক ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। আলোয় তার পেটিকোটের সাদা বর্ডারটার ক্ষীণ আভাস।

সে বলে, গেলে তোমার লাভই হত।

আমি জবাব দিই, যদি যাই, আপনার জন্যে কিছু একটা নিয়ে আসবো।

তারপর থেকে নির্বোধের মতো আমার কতো যে জল্পনা! সেসব জল্পনা শয়নে জাগরণে সকল চিন্তা জুড়ে থাকে। রাত্তির ফাঁকে ফাঁকে দিনগুলোকে লাগে ক্লান্তিকর। ইচ্ছে হয়, দিনগুলো ধ্বংস করে ফেলি। ইস্কুলের পড়াটড়ায় রাগে গা জ্বলে যায়। আমি বইয়ের যে-পাতাটাই পড়বার চেষ্টা করি, তার ছায়ামূর্তি সেটা আড়াল করে আমার চোখের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। রাত্তিরে আমার শোবার ঘরে, দিনের বেলায় ক্লাসরুমে। নিস্তব্ধতায় আমার আত্মা বড়ো সুখ পায়। ও-জিনিষ আমাকে প্রাচ্যের জাদুর মতো আচ্ছন্ন করে ফেলে। ওরই ভেতর দিয়ে 'এ্যারাবি' শব্দটির অক্ষরগুলো আমার কাছে ছুটে আসে।

অবশেষে বাড়ীতে জানাই, শনিবার রাত্তিরে আমাকে একটু ছেড়ে দিতে হবে। বাজারে যাবো।

চাচীমা অবাক হন, ফ্রীম্যাসন ক্লাবের গোপন আড্ডা টাড্ডায় যাবিনে নিশ্চয়ই!

ক্লাসে আমি খুব কম প্রশ্নেরই উত্তর দিই। লক্ষ্য করি, আমার শিক্ষকের মিষ্টি মুখখানা ক্রমে কড়া হয়ে উঠছে। তিনি বলেন, আশা করি, তোমাকে কুঁড়েমিতে ধরেনি।

আমার এলোমেলো ভাবনাগুলোকে কিছুতেই গুছিয়ে আনতে পারিনে। জীবনের আসল কোনো কাজে বড়ো একটা ধৈর্য থাকে না। কেননা, ওসব আমার মনোবাঞ্ছা পূরণের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ওগুলো আমার কাছে মনে হয় ছেলেখেলা। কুৎসিত এবং একঘেয়ে।

শনিবার সকলবেলা চাচাকে স্মরণ করিয়ে দিই, সন্ধে'বেলা বাজারে যেতে চাই।

তিনি হলঘরের স্ট্যাণ্ডটার কাছে দাঁড়িয়ে অকারণে চেঁচামেচি করছিলেন। নাকি তাঁর হ্যাটব্রাশ খুঁজছেন। আমার কথা শুনে সংক্ষেপে জবাব দেন, হ্যাঁ, বাপু, জানি।

চাচা হলঘরে। আমার তাই সামনের বৈঠকখানায় গিয়ে জানলার কাছে শুয়ে থাকা হয় না। সুতরাং খিঁচড়ানো মন নিয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়ি। আস্তে আস্তে ইস্কুলের দিকে হাঁটতে থাকি। হাওয়াটা বড়ো ঠাণ্ডা। মনটা এরই মধ্যে সন্দেহে ভরে উঠেছে।

ডিনারের জন্যে বাড়ী ফিরেছি। কিন্তু চাচা এখনো ফেরেননি। তবে, এখনো সময় আছে।

আমি কিছুক্ষণ ঘড়ির দিকে চোখ রেখে বসে থাকি।

কিন্তু একসময় ঘড়ির টিক টিক শুনতে শুনতে বিরক্তি ধরে যায়।

এবার আমি ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ি। সিঁড়ি দিয়ে সোজা

ওপরতলায় চলে যাই।

ওপরতলার ঘরগুলো উঁচু-উঁচু এবং ফাঁকা। কিন্তু ঠাণ্ডায় আর বিষণ্ণতায় ভরা। তবু ঘরগুলো আমাকে মুক্তি দেয়। আমি গান গেয়ে গেয়ে এ-ঘর থেকে ও ঘেড়ে ঘুরে বেড়াই। এক সময় সামনের জানলায় দাঁড়িয়ে দেখি, আমার সঙ্গীরা নীচের রাস্তায় খেলা করছে। তাদের চেঁচামেচির আওয়াজও আমার কানে আসে। কিন্তু দুর্বল এবং অস্পষ্ট হয়ে।

একবার আমি জানলার ঠাণ্ডা কাচে কপাল ঠেকিয়ে ওপাশের অন্ধকার বাড়ীটার দিকে তাকাই। যেখানে সেই মেয়েটি থাকে। বোধ হয় ঘণ্টাখানেক আমার এইভাবেই কেটে যায়। কিছুই না দেখে। শুধু আমার কল্পনায় বাঁধা পড়ে চোখের সামনে ভেসে থাকে সেই বাদামী রঙের পোশাক-পরা দেহমূর্তি। যার গলার বাঁকের ওপর অপরূপভাবে বাতির আলো এসে পড়েছে। রেলিংয়ের ওপর রাখা হাতখানিতে আর গাউনের শেষ মাথায় পেটিকোটের বর্ডারেও যার আলোর ঝলমলানি।

নীচে ফিরে এসে দেখি, মিসেস মার্সার আগুনের কাছে বসে আছেন। এক বন্ধকী দোকানদারের বিধবা বউ এই বুড়ী মহিলা বড়ো বেশী কথা বলেন। কি জানি এক সাধু উদ্দেশ্যে তিনি ব্যবহার-করা স্ট্যাম্প সংগ্রহ করেন। আমাকে চায়ের টেবিলে বসে তাঁর গল্পগুজব সয়ে যেতে হয়।

ডিনারের সময়টা আমরা টানতে টানতে লম্বা করে এক ঘণ্টার ওপর নিয়ে যাই। তবু চাচা ফেরেন না।

এবার মিসেস মার্সার বিদায় নেয়ার জন্যে উঠে দাঁড়ান, দুঃখিত, আমি আর অপেক্ষা করতে পারছিনে। আটটা পার হয়ে গেছে।

এতো রাত তক বাইরে থাকাটা আমি পছন্দ করিনে। রাতের হাওয়াটা তো আমার জন্যে ভালো নয়।

তিনি চলে যাওয়ার পর আমি ঘরের মধ্যে পায়চারি শুরু করি। হাত দুখানায় মুঠি পাকিয়ে।

চাচীমা বলেন, আজ রাত্তিরে তোর বোধ হয় আর বাজারে যাওয়া হচ্ছে না।

রাত ন'টায় আওয়াজ পাওয়া যায়, চাচা হুড়কোতে চাবি লাগিয়ে হলঘরের দরজা খুলছেন। আপন মনে কী সব কথাও বলছেন তিনি। যখন তাঁর ওভারকোটটা নামিয়ে রাখেন, তার ভারে হলঘরের স্ট্যাণ্ডটা দুলে ওঠে। এই শব্দগুলোর অর্থ আমি জানি।

তাঁর ডিনার এখন মাঝপথে। এবার আমি তাঁর কাছে বাজারে যাওয়ার পয়সা চাই।

তিনি ভুলে গিয়েছিলেন। বলেন, লোকে তো শুয়ে পড়েছে রে। তাদের এখন ভাতঘুমের সময়।

আমি কিন্তু তাঁর রসিকতায় হাসলাম না

চাচীমা গলা চড়িয়ে বলেন, টাকাটা দিয়ে দিলেই তো হয়। ও চলে যেতে পারে। তুমি ছেলেটাকে অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছো।

চাচা এবার জবাব দেন, আমি অত্যন্ত দুঃখিত। ভুলে গিয়েছিলাম। পুরোণো সেই প্রবাদটা ঠিক কথাই বলেছে: সারাক্ষণ কাজ নিয়ে থাকলে বুদ্ধিমান মানুষও হাবা বনে যায়। হ্যাঁ, আমি এটা বিশ্বাস করি।

তারপর তিনি আমার দিকে ফেরেন, কোথায় যাবি রে?

আবার তাঁকে জায়গাটার কথা জানাতে হল।

: তুই কি "দ্য এ্যারাব'স ফেয়ারওয়েল টু হিস স্টীড" কবিতাটা পড়েছিস ?

আমি যখন রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আসি, তিনি তখন কবিতাটার প্রথম লাইনগুলো চাচীমাকে শোনাবার উপক্রম করছেন।

এবার আমি বাকিংহাম স্ট্রীট ধরে জোর কদমে স্টেশনের দিকে এগোই। হাতের মুঠোয় শক্ত করে চেপে ধরা একটা ফ্লোরিন (দুই শিলিং)। রাস্তাঘাট গ্যাসের আলোয় ঝলমলে। সর্বত্র খদ্দেরের ভীড়। এসব দেখে আমার মনে পড়তে থাকে, আমি কি জন্যে বেরিয়েছি।

স্টেশনে একটা থার্ড ক্লাস কামরায় উঠে বসি। গাড়ীটা পোড়োবাড়ীর মতো ফাঁকা। স্টেশনে সে অসহনীয়ভাবে দেরী করে। তারপর এক সময় ধীরে ধীরে স্টেশন ছেড়ে বেরোয়। জীর্ণ বাড়ী-ঘর আর ঝিকমিক-করা একটা নদী পেরিয়ে গুঁড়ি মেরে এগুতে থাকে। ওয়েস্টল্যাণ্ড রো স্টেশনে এক দল লোক ভীড় করে দরজা-গুলোর মুখে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। কিন্তু কুলিরা তাদের টেনে সরিয়ে দেয়। বলে, এটা স্পেশাল ট্রেন, বাজারে যাবে।

আমি একা খালি কামরাটায় বসে থাকি।

মিনিট কয়েক পর গাড়ীখানা একটা কাঠের প্ল্যাটফরমের পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। প্ল্যাটফরমটা যেন এর জন্যে তৈরী ছিলো না।

গাড়ী থেকে নেমে আমি রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াই। আলো-ওয়ালা একটি ঘড়ির কাঁটার দিকে চোখ পড়ে। দশটা বাজতে দশ মিনিট বাকী।

আমার সামনে একটা বিরাট বাড়ী। তার গায়ে সেই জাদুময় নাম লেখা।

ভেতরে যাওয়ার ছয় পেনির কোনো গেট খুঁজে পাইনে। দেরী করলে বাজার বন্ধ হয়ে যেতে পারে। আমি তাই তাড়াতাড়ি ঘোরা-ফটক দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ি। পাশে দাঁড়ানো ক্লান্ত চেহারার একটি লোকের হাতে একটা শিলিং গুঁজে দিয়ে।

এবার আমি এসে দাঁড়াই মস্তো এক হলঘরে। যার দেয়ালের অর্ধেকটা এক গ্যালারি। চারদিকেই। প্রায় সব দোকানই বন্ধ হয়ে গেছে। এবং হলের বেশীর ভাগ জায়গাই অন্ধকার। চারদিকে একটা পরিচিত গোছের নিস্তব্ধতা। উপাসনার পর এমনি এক নিস্তব্ধতায় গীর্জা ছেয়ে থাকে।

আমি ভীরু পায়ে বাজারের কেন্দ্রের দিকে এগিয়ে যাই। এখনো যে দোকানগুলো খোলা আছে, সেগুলোর কাছে জনা-কয়েক লোকের ভীড়। একটা পর্দার মাথায় রঙীন বাতি দিয়ে লেখা—'কাফে শঁাতাঁ'। পর্দাটার সামনে দুজন লোক রেকাবিতে রাখা টাকাকড়ি গুনছে। রেকাবির ওপর ঠুন ঠুন আওয়াজ। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনতে থাকি।

এখন আমি প্রায় মনেই করতে পারিনে, এখানে কি জন্যে এসেছি। একটা স্টলের সামনে গিয়ে দাঁড়াই। স্টলটায় পোর্সিলেনের কারুকাজ-করা পাত্র আর ফুলদার টী-সেট সাজানো। জিনিষগুলো আমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে থাকি। স্টলের দরজার কাছে একটি তরুণী দুজন অল্পবয়েসী ভদ্রলোকের সাথে কথা বলছে আর হাসছে। আমি তাদের ইংরেজী উচ্চারণ লক্ষ্য করি। তাদের কথাগুলো অস্পষ্টভাবে কানে আসে।

: না, এমন কথা আমি কখ্‌খনো বলিনি।

: না, তুমি বলেছো।

: না, আমি বলিনি।

: ও বলেনি এই কথা ?

: হ্যাঁ। আমি শুনেছি।

: উঃ ! একটা—মিথ্যুক !

আমাকে দেখে মেয়েটি এগিয়ে আসে। জিজ্ঞেস করে, কিছু কিনতে চাও ?

তার গলার স্বরটা উৎসাহ দেওয়ার মতো নয়। সে যেন শুধু কর্তব্যের খাতিরে আমাকে কথাটা জিজ্ঞেস করে।

স্টলে ঢোকার পথটা অন্ধকার। তার দু'পাশে বিরাট বিরাট পাত্র সাজানো। সেগুলো যেন পুবদেশী পাহারাওয়ালার মতো দাঁড়িয়ে আছে। আমি নম্র চোখে পাত্রগুলোর দিকে চেয়ে আস্তে করে জবাব দিই, না। ধন্যবাদ।

মেয়েটি একটা পাত্র একটু সরিয়ে রেখে তরুণ দুটির কাছে ফিরে যায়। তারপর আবার তারা সেই একই বিষয় নিয়ে কথা বলতে থাকে। মেয়েটি দুই-একবার ঘাড় ফিরিয়ে আমার দিকে চায়।

আমি জানি, এখানে আমার দাঁড়িয়ে থাকাটা অর্থহীন। তবু আমি দাঁড়িয়েই থাকি। এই কথা বোঝবার জন্যে যে, পাত্রগুলো সম্পর্কে আমার কৌতূহল মিথ্যে নয়, যথেষ্ট বাস্তব।

তারপর আমি আস্তে আস্তে ঘুরে দাঁড়াই। বাজারের মাঝখানটি দিয়ে বাইরের দিকে এগুতে থাকি। হাতে এতোক্ষণ দুটো পেনি ছিলো। পেনি দুটো এবার পকেটের ভেতর ছেড়ে

দিই। সেগুলো ভেতরের ছয়টা পেনির ওপর গিয়ে পড়ে।

গ্যালারির এক মাথা থেকে কে যেন বলে ওঠে, আলো চলে গেছে।

হলটা তখন একেবারেই অন্ধকার।

অন্ধকারের ভেতর অপলক চোখ ফেলে হাঁটতে হাঁটতে মনে হয়, আমাকে এক অহমিকা তাড়িয়ে ফিরছে, বিদ্রূপ করছে।

এবার রাগে আর ক্ষোভে আমার চোখ দুটি জ্বলে যেতে থাকে।

আলবার্তো মোরাভিয়া

লরি ড্রাইভার

আমি মানুষটা রোগা-পাতলা এবং ভীতু। আমার হাত দুখানা কাঠির মতো, পা লম্বা। আর, কামর এমনি চুপসানো যে, ট্রাউজারটা কেবলই নেমে যেতে থাকে। সত্যি বলতে কি, ভালো লরি ড্রাইভারের যেমনটি হওয়া দরকার, আমি ঠিক তার উলটো।

আপনারা কি কখনো লরি ড্রাইভারদের লক্ষ্য করেছেন? তারা সবাই দশাসই লোক। তাদের কাঁধ চওড়া, হাতের ডিমা উঁচু-উঁচু, পিঠ আর পেট মজবুত। কেননা, লরি ড্রাইভারকে বিশেষভাবে তার হাত, পিঠ আর পেটের ওপরই নির্ভর করতে হয়। হাতের ওপর এজন্যে যে, এটাই স্টিয়ারিং হুইল ঘোরাবার হাতিয়ার। লরিতে যে-হুইলটির ব্যাস পুরো একখানা হাতের প্রায় সমান এবং পাহাড়ী পথে যা মাঝে মাঝে পুরো এক পাক ঘোরাতে হয়। পিঠের ওপর এ-কারণে যে, ওটা ঘণ্টার পর ঘণ্টা খাড়া রেখে একই জায়গায় চুপচাপ বসে থাকা দরকার। তার ব্যথা করা বা অসাড় হওয়া চলবে না। সবশেষে, পেটের ওপর

এই হেতু যে, সেটাই লরি ড্রাইভারকে তার সীটে শক্তভাবে বসিয়ে রাখে, মাটিতে বসানো পাথরের চাঁইয়ের মতো।

এসব তো গেল দৈহিক দিকের কথা। মানসিক দিক থেকে আমি আরো অযোগ্য। লরি ড্রাইভারের কোনো মানসিক দুর্বলতা থাকতে নেই। কোনো খেয়ালিপনা, বাড়ীর জন্যে মন-কেমন-করা ভাবটাব বা অন্য কোনো কোমল অনুভূতিও। ড্রাইভিং এমনি রাগ-ধরানো আর ক্লান্তির ব্যাপার যে, তাতে একটা ষাঁড়ের জান খতম করে দেওয়া যায়। আর, মেয়েমানুষের কথা তুললে বলতে হয়, ওদিকে লরি ড্রাইভারদের বেশী নজর থাকা উচিত নয়, সারেঙদের মতো। লরি ড্রাইভারের দিন কাটে সর্বক্ষণ এখান থেকে সেখানে ছুটোছুটি করে। তারা মেয়েমানুষের দিকে নজর দিলে একদম পাগল হয়ে যাবে। আমার মনটা কিন্তু নানান চিন্তায় ভরা। আগে থেকেই এটা-সেটার ভাবনায় জোড়া। তার ওপর, আমি স্বভাবগতভাবে মন-মরা। এবং আমি মেয়েমানুষ পছন্দ করি।

যাক সেকথা।

আমি চেয়েছিলাম, লরি ড্রাইভার হবো। যদিও এটা ঠিক আমার উপযুক্ত কাজ নয়। কিন্তু চেয়েছি যখন, তখন একটা ট্রান্সপোর্ট কোম্পানিতে ঢোকার ব্যবস্থাও করে ফেলেছি।

আমার সহকর্মী হিসেবে তারা আমাকে পালোম্বি নামে একটি ছোকরাকে দেয়। আমি না বলে পারছিনে,—এই মেট ছোকরা একদম গাঁইয়া। আরো বলা দরকার, সে সত্যিই একটা পাকা লরি ড্রাইভার। লরি ড্রাইভাররা বুদ্ধিমান, এমন কিছু আমি কইবো না। তাদের বেশীর ভাগই বরং মাথামোটা। কিন্তু পালোম্বি এ-ব্যাপারে রীতিমত ভাগ্যবান। সে একটা হাঁদারাম।

ফলে, সে তার লরির সঙ্গে মিশে গেছে।

পালোম্বির বয়েস এখন তিরিশের ওপর। তবু, তার ভেতর বয়েসের তুলনায় বেশী বেড়ে ওঠা ছেলেদের মতো কিছু ভাবসাব রয়ে গেছে। তার মুখখানা গোলগাল। গাল দুটো ফোলা-ফোলা। চাপা কপালের নীচে বসানো চোখ দুটো ছোটো ছোটো-ঠোঁটের ফাঁকটি যেন ক্যাশ বাক্সের ডালায় কাটা ফুটো। সে কথা বলে কম,—সত্যি বলতে কি. কদাচিৎ। মনের ভাবটাব ঘোঁত ঘোঁত গোছের আওয়াজে প্রকাশ করাটাই তার বেশী পছন্দ।

তার বুদ্ধি খোলে শুধু তখন, যখন কিছু খাওয়ার কথা ওঠে।

আমার একবারের কথা মনে পড়ে। সেদিন নেপলস যাওয়ার পথে ইত্রির একটা সরাইখানায় ঢুকেছিলাম। দুজনেই তখন ক্লান্ত। পেটে দারুণ ক্ষিধে। কিন্তু সরাইখানাটায় খাবার বলতে ছিলো শুধু শুয়োরের নোনা চর্বি দিয়ে রাঁধা শিম। আমার এ জিনিষ সহ্য হয় না। আমি তাই নামে মাত্র হাত ছোঁয়ালাম। কিন্তু পালোম্বি পুরো দু'গামলা গপসায়। তারপর গতরটা কোনো রকম টেনেটুনে চেয়ারের পিঠে হেলান দিয়ে, মুহূর্তখানেক গম্ভীর মুখে আমার দিকে চেয়ে থাকে। ভাবখাণা এমনি, যেন আমাকে দরকারী কিছু বলতে চায়। শেষ পর্যন্ত পেটে হাত বুলোতে বুলোতে জানায়, আরো চার প্লেট খেতে পারতাম।

এমন বিরাট খবরটা দিতে তার এতোক্ষণ লাগলো!

এই ছোকরাটি—যে কিনা কাঠেরও হতে পারতো,—সঙ্গে থাকায় ইতালিয়ার সাথে আমার প্রথম সাক্ষাতের সময় আমি যে কতোটা খুশী হয়েছিলাম, তা আপনাদের না বললেও চলবে। তখন

আমরা রোম-নেপলস করি। হরেক রকম মাল নিয়ে। ইট, পুরোণো লোহা, নিউজপ্রিন্টের রোল, কাঠ, ফল,—এমনি আরো কতো জিনিষ! মাঝে মাঝে এমনকি ভেড়ার পালও নিয়ে যাই। এক মাঠ থেকে আর এক মাঠে।

এরই মধ্যে একদিন তেরাচিনায় আমাদের লরি থামিয়ে ইতালিয়া অনুরোধ জানালো, আমাকে একটু রোম নিয়ে যাবেন?

আমাদের ওপর হুকুম রয়েছে, কাউকে লিফট দেবে না। কিন্তু ইতালিয়াকে এক নজর দেখেই আমরা মন ঠিক করে ফেললাম। এক্ষেত্রে নিয়মটা খাটবে না।

তাকে ইশারা করে বললাম, উঠে পড়ো।

সে লাফ দিয়ে উঠে এলো। যতো দ্রুত গতিতে সম্ভব। বললো, লরি ড্রাইভারদের ধন্যবাদ। আপনারা সব সময়ই খুব ভালো ব্যবহার করেন।

ইতালিয়া রক্ত গরম-করানো মেয়ে। হ্যাঁ, তার সম্পর্কে এছাড়া আর কিছুই বলা সম্ভব নয়। তার কোমরটা অবিশ্বাস্য রকমের লম্বা আর সরু। এই কোমরের ওপর দিকে কাঠির মতো খাড়া হয়ে থাকা ধড়টা স্পষ্টতঃই বিষে ভরা। সে সাধারণতঃ আঁটোসাঁটো জাম্পার পরে। আর, সেই জাম্পার পাছা তক নেমে আসে। সেদিনও তার গায়ে ছিলো এমনি এক জাম্পার। তার গলাটাও লম্বা। মাথাটা ছোটো, বাদামী রঙের চুলে ভরা। চোখ দুটি বড়ো বড়ো, সবুজ। ঢ্যাঙা ধড়টার তুলনায় পা দুখানা খাটো। আর, একটু বাঁকা। তাকে দেখলে তাই মনে হয়, সে হাঁটু ভাঁজ করে হাঁটে।

সে ঠিক সুন্দরী নয়। কিন্তু তার ভেতর এমন কিছু আছে,

যা রূপের থেকে বড়ো।

এর প্রমাণ আমি প্রথম ট্রিপেই পাই।

আমরা তখন চিন্তার্ণা তক এসে গেছি। লরি চালাচ্ছে পালোম্বি। হঠাৎ ইতালিয়া আমার হাতের ভেতর হাত ঢুকিয়ে জোরসে একটা মোচড় দিলো। তারপর তার হাত আর নড়ে না। আমি ছাড়া পেলাম একেবারে ভেল্লেত্রিতে এসে। যখন পালোম্বিকে সরিয়ে আবার স্টিয়ারিং হুইল ধরি।

সময়টা এখন গরমের। বেলা প্রায় চারটে। দিনের এই সময়টাই সবচেয়ে গরম। আমাদের হাত দুখানা গরমে একদম পিছল হয়ে গেছে। কিন্তু ইতালিয়ার সেদিকে খেয়াল নেই। সে মাঝে মাঝেই বেদেনীর মতো সবুজ চোখে আমার দিকে তাকাচ্ছে। অনেক কাল আমার কাছে জীবন ছিলো শুধু এ্যাসফল্টের একটা ফিতে। সেই জীবন আজ যেন আবার হেসে উঠেছে। এতো দিন আমি যা খুঁজে ফিরেছি, তা আজ পেয়ে গেছি। একটি মেয়ে। যাকে নিয়ে এটা-ওটা ভাবা যায়।

চিন্তার্ণা আর ভেল্লেত্রির মাঝামাঝি একটা জায়গায় একবার গাড়ী থামায় পালোম্বি। নীচে নেমে গিয়ে চাকাগুলো দেখতে থাকে। এই সুযোগে আমি ইতালিয়াকে একটা চুমো খেয়ে নিলাম। তারপর ভেল্লেত্রিতে এসে, ইচ্ছে করেই পালোম্বিকে সরিয়ে স্টিয়ারিং হুইলে বসি। আজকের মতো হাত জড়াজড়ি আর একটা চুমোই আমার জন্যে যথেষ্ট।

এরপর থেকে ইতালিয়া আমাদের পেয়ে বসে। নিয়মিতভাবে রোম থেকে তেরাচিনা, তেরাচিনা থেকে রোমে নিয়ে যাওয়ার আবদার

জানাতে থাকে। প্রতি সপ্তাহে একবার,—এমনকি, দু'বারও।

সে সকালবেলা দেয়ালের কাছে দাঁড়িয়ে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করে। সব সময় তার সঙ্গে থাকে কোনো না কোনো রকমের একটা পোঁটলা। নয়তো স্যুটকেস। আর, পালোম্বি যদি স্টিয়ারিং হুইলে থাকে, সে সারা পথ আমার হাতে হাত জড়িয়ে রাখে। একেবারে তেরাচিনা তক। আমাদের নেপলস থেকে ফেরবার সময় সে অপেক্ষা করে তেরাচিনায়। তারপর, গাড়ীতে উঠতেই শুরু হয়ে যায় হাত-জড়াজড়ি। আর, আমার সেই লুকিয়ে চুমো খাওয়া। এমনকি, তার ইচ্ছে না থাকলেও। এবং এই ব্যাপারটা ঘটে তখন, যখন পালোম্বির আমাদের দিকে তাকাবার ফুরসত থাকে না।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, আমি দারুণভাবে প্রেমে পড়ে গেলাম।

কিছুটা এই জন্য যে, অনেক দিন কোনো মেয়েকে আমার ভালো লাগেনি। মেয়েদের সাথে সে-রকম ঘনিষ্ঠ হওয়ার অভ্যাসটাই আমি এর মধ্যে হারিয়ে ফেলেছিলাম। কিন্তু এবার আমার দশা এমনি দাঁড়ায় যে, ইতালিয়া একবার শুধু বিশেষ এক ভঙ্গিতে আমার দিকে তাকালেই হল, সঙ্গে সঙ্গে আমি যেন একটা শিশু বনে যাই। মুহূর্তে অভিভূত হয়ে পড়ি। এমনকি, চোখে পানি এসে যায়। সে-পানি দরদী ভালোবাসার। কিন্তু আমার কাছে মনে হয় দুর্বলতার। যে-দুর্বলতা পুরুষকে মানায় না। আমি তাই প্রাণপণে চেষ্টা করি চোখের পানি চেপে রাখতে। যদিও তাতে কোনো ফল হয় না। আমি যখন গাড়ী চালাই, দুজনে চাপা গলায় কথা বলি। পালোম্বি তখন ঘুমিয়ে থাকে,—তারই সুযোগ নিয়ে।

কি কথা যে এসব সময় আমরা বলাবলি করেছি, আজ আর মনে পড়ে না। এর থেকেই বোঝা যায়, সেসব ছিলো তুচ্ছ কথা। হাসি-ঠাট্টা আর প্রেমিক প্রেমিকার আলগা আলাপ। এটুকু অবশ্যি মনে আছে যে, সময়টা তাড়াতাড়ি কেটে যেতো, তেরাচিনা থেকে এ্যাসফল্টের ফিতেটা যেন জাদুবলে সেতো হাওয়ায় মিলিয়ে। অথচ এমনিতে আগে মনে হয়েছে, এই পথটার যেন শেষ নেই।

সে যা-ই হোক, এসব সময়ে আমি গাড়ীর স্পীড কমিয়ে ঘণ্টায় কুড়ি বা পনেরো মাইলে নামিয়ে আনি। সব কিছু যাতে আমার পাশ কাটিয়ে চলে যেতে পারে। এমনকি, প্রায় ক্ষেত্রে খামারের গরু ঘোড়ার গাড়ীও। অবশ্যি, যেখানে যাবার, সেখানে আমি পৌঁছে যাই সময়মতোই। তারপর ইতালিয়া নেমে পড়ে।

রাত্তিরে সময় কাটে আরো সুখে। তখন মনে হয়, লরি-খানা যেন প্রায় আপনা থেকেই এগিয়ে চলেছে। আমার একখানা হাত থাকে হুইলে, একখানা ইতালিয়ার কোমর জড়িয়ে। দূরের অন্ধকারের ভেতর অন্যান্য গাড়ীর হেডলাইট দেখা দিয়েই মিলিয়ে যায়। আমার তখন ইচ্ছে হয়, আমাদের লরির হেডলাইটে কোনো একটি কথা ফুটিয়ে তুলে তাদের সিগন্যালের জবাব দিই। যাতে সবাই জানতে পারে, আমরা কতো সুখী। আমি ইতালিয়াকে ভালোবাসি এবং ইতালিয়া আমাকে ভালোবাসে, ইচ্ছে হয়, এমনি কোনো কথা ফুটিয়ে তুলি।

পালোম্বি হয় এসবের কিছুই লক্ষ্য করে না, নয়তো লক্ষ্য না করবার ভান করে। এই যে ইতালিয়া এতো ঘন ঘন লরিতে চাপছে, এতে তাকে কখনো আপত্তি জানাতে দেখিনে। একটি

বারও না। ইতালিয়া যখন গাড়ীতে ওঠে, পালোম্বি তাকে 'ঘোঁৎ' গোছের একটা আওয়াজ করে অভিবাদন জানায়, তারপর একটু সরে গিয়ে তার বসবার জায়গা করে দেয়। ইতালিয়া সব সময় মাঝখানে বসে। তার কারণ, আমাকে রাস্তার দিকে নজর রেখে পালোম্বিকে এটা-ওটা জানাতে হয়। অন্য গাড়ীকে ওভারটেক করবার দরকার আছে কিনা, রাস্তা ফাঁকা আছে, কি, নেই, — এই সব।

পালোম্বি আর একটা ব্যাপারেও আপত্তি জানায় না। যখন আমি ভাবের আবেগে উইণ্ড স্ক্রীনের কাচের ওপর এমন একটা কিছু লিখে ফেলতে চাই, যাতে ইতালিয়ার কথা বোঝাবে। এটা নিয়ে আমি কিছু চিন্তা-ভাবনা করি। তারপর সাদা হরফে লিখে দিই : ইতালিয়া জিন্দাবাদ। কিন্তু পালোম্বিটা এমনি গবেট যে, একবারও লক্ষ্য করে না, কথাটার দুটো মানে আছে। এটা সে বুঝতে পারে শুধু তখন, যখন কয়েকজন লরি ড্রাইভার রসিকতার সুরে আমাদের শুধোয়, ব্যাপার কি হে ? তোমরা এমন দেশভক্ত হয়ে উঠলে কেন ?

প্রশ্নটা শোনার পর সে হাঁ করে আমার দিকে চেয়ে থাকে। তারপর তার মুখে আস্তে আস্তে একটু হাসি ফুটে ওঠে। সেই হাসি জড়িয়ে সে বলে, ওরা ভাবছে, এটা ইতালির কথা। আসলে তো মেয়েটার। — তোমার মাথা আছে বটে। জবর বুদ্ধির খেল দেখিয়েছো।

এসব চলে মাস দুয়েক—কিংবা বোধ হয় তার থেকে কিছু বেশী দিন।

তারপর একদিনের কথা।

আমরা রোজকার মতো ইতালিয়াকে তেরাচিনায় নামিয়ে দিয়ে নেপলস গিয়েছিলাম। সেখানে হুকুম হল, মাল খালাস করে এক্ষুণি রোম চলে যাও। রাত্তিরে নেপলসে থাকা চলবে না।

হুকুম শুনে আমি বিরক্ত হলাম। কেননা, পরদিন সকালে আমাদের ইতালিয়াকে লিফ্‌ট্‌ দেওয়ার কথা আছে। এখন লাও এই হুকুম!

ফেরবার পথে হুইলে বসলাম আমি। পালোম্বি এক লহমার মধ্যেই নাক ডাকাতে শুরু করলো।

পথে সব কিছুই ভালোয় ভালোয় কাটলো। একেবারে ইত্রি-তক। তার কারণ, রাস্তাটা বাঁকে ভরা। আর, রাত্তিরে লরি ড্রাই-ভারের যখন ক্লান্তি ধরে আসে, তখন বাঁকগুলো তাকে চোখ খোলা রাখতে বাধ্য করে,—ওইগুলোই হয়ে দাঁড়ায় তার সব-চেয়ে বড়ো বন্ধু।

ইত্রি পেরিয়ে ফন্দির কমলাবাগানের ভেতর দিয়ে যাওয়ার সময় কিন্তু আমার ঘুম পেতে শুরু করলো। জেগে থাকবার চেষ্টায় আমি এবার ইতালিয়ার কথা ভাবতে লাগলাম। কিন্তু তার কথা ভাবতে গিয়েও দেখি, আমার ভাবনাগুলো ক্রমশঃ জট পাকিয়ে যাচ্ছে। জমাট থেকে আরো জমাট হয়ে। ঠিক যেমনটি ঘটে বনের ভেতর। ডালপালা ক্রমশঃ ঘন হতে থাকে, শেষকালে একদম অন্ধকার হয়ে যায়। আজও ভুলিনি,—এক সময় আমি হঠাৎ মনে মনে বলে উঠলাম, আমার কপাল ভালো, ইতালিয়ার ভাবনা আছে। তাই তো আমাকে জাগিয়ে রাখতে পারছি। ···নইলে এতোক্ষণে ঘুমিয়ে পড়তাম।

অবশ্যি, ইতিমধ্যে আমি ঘুমিয়েই গেছি। ওসব কথা জেগে থাকা অবস্থায় ভাবিনি, ভেবেছি ঘুমের ভেতর। আর, ঘুমন্ত অবস্থার এই ভাবনা আমাকে আরো ভালো করে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছে, আমি আরো হ'ল-ছাড়াভাবে ঘুমিয়েছি। সেই সঙ্গেই বুঝতে পারলাম, লরিখানা রাস্তা ছেড়ে একটা খাদে মুখ থুবড়ে পড়লো। লরির পেছন দিকে গাঁথা ট্রলারখানা ভেঙেচুরে ঝাঁকি মেরে উলটে যাচ্ছে, সে আওয়াজও পেলাম।

গাড়ী আস্তে আস্তে যাচ্ছিলো। তাই, জখম-টখম কেউ হলাম না। কিন্তু কোনোক্রমে বেরিয়ে যখন আসি, তখন দেখা যায় দারুণ ব্যাপার। ট্রলারখানা আকাশের দিকে চাকা তুলে একদম চিত হয়ে আছে। তাতে বোঝাই করা ছিলো ট্যান-করা চামড়া। সব এখন গাদা মেরে খাদের ভেতর পড়ে রয়েছে। চারদিকে হালকা অন্ধকার,—চাঁদ নেই, কিন্তু আকাশটা তারায় ভরা। এদিকে, কপাল ভালো, আমরা এখন আছি প্রায় তেরাচিনায় ঢোকার পথে। ডান দিকে খাড়া পাহাড়, বাম দিকে আঙুরবাগান, তার ওপাশে শান্ত কালো সমুদ্র।

পালোম্বি শুধু বললো, শেষ পর্যন্ত কাণ্ডটা তুমি করলেই। এখন তেরাচিনাতেই উদ্ধারের পথ খুঁজতে হবে।

বলেই সে তেরাচিনার দিকে রওনা হল।

পথ সামান্যই। আমরা তেরাচিনার ঠিক পাশেই আছি। তাই দেখে পালোম্বি বলে, আমার ক্ষিধে পেয়েছে। উদ্ধারের জন্যে ক্রেন নিয়ে লরি আসতে ঘণ্টা কয়েক লেগে যাবে। তার আগেই একটা সরাইখানায় ঢুকে পড়া ভালো।

তার তো সব সময় শুধু খাবার চিন্তা।

সুতরাং শহরে ঢুকে দুজনে সরাইখানার খোঁজে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগলাম। কিন্তু রাত দুপুর গড়িয়ে গেছে। আর, এই গোল জায়গাটায়, বোমা পড়বার ফলে যার মাঝে মাঝেই ফাঁকা,-কাফে পাওয়া যায় মাত্র একটা। সেটাও বন্ধ হয়ে যাচ্ছিলো। সেখান থেকে ঘুরে আমরা একটা ছোটো রাস্তায় পড়ি,—সম্ভবতঃ রাস্তাটা সমুদ্রের দিকে গেছে। খানিক দুর এগুতেই একটা আলো দেখা যায়। আর, দরজার ওপর একটা চিহ্ন।

এবার দুজনে তাড়াতাড়ি পা চালাতে লাগলাম। আশা বাড়ছে।

হ্যাঁ, এটা সরাইখানাই বটে। তবে, জানলার ঘোরানো খড়খড়ি অর্ধেক নামানো। যেন সরাইখানাটা এখনই বন্ধ করে দেওয়া হবে। পাল্লাগুলো কাচের। খড়খড়ির তলায় এক ফালি কাচ বেরিয়ে আছে। সেখান দিয়ে ভেতরে উঁকি মারা যায়।

পালোম্বি ঝুঁকে পড়ে ভেতরে চোখ ফেললো, দেখাই যাচ্ছে, বন্ধ।

আমিও নুয়ে পড়ে উঁকি দিলাম।

একটা বড়ো কামরা। মফঃস্বলের সরাইখানায় যেমন হয়। ভেতরে খানকয়েক টেবিল সাজানো। আর আছে একটা কাউন্টার। চেয়ারগুলো সব উলটে টেবিলের ওপর তুলে রাখা হয়েছে। আর—ঘরে ইতালিয়াকে দেখা যাচ্ছে! হাতে একখানা ঝাঁটা। ঝপা-ঝপ ঘরখানা পরিষ্কার করছে। কোমরে বড়ো একখানা ঝাড়ন জড়ানো। কাউন্টারের ওপাশে, ঘরটার ঠিক পেছন দিকে, দাঁড়িয়ে আছে একটা কুঁজো লোক। কুঁজো আমি আগেও দেখেছি। কিন্তু এমন নিখুঁত কুঁজো আর কখনো চোখে পড়েনি। মুখখানা দুই হাতের মাঝখানে বসানো। কুঁজটা মাথার থেকেও উঁচু।

লোকটি কুৎসিত, কালো, রুক্ষ চোখে একদৃষ্টে ইতালিয়ার দিকে চেয়ে আছে। ইতালিয়া চটপট ঝাঁট দিয়ে চলেছে। লোকটা একটুও নড়ে না। কিন্তু একবার ইতালিয়াকে কি যেন বলে। ইতালিয়া এবার তার দিকে এগিয়ে আসে। ঝাঁটাখানা কাউন্টারের গায়ে খাড়া করে রেখে তা গলা জড়িয়ে ধরে। তারপর দীর্ঘ, গাঢ় এক চুমো।

চুমো খাওয়ার পর ইতালিয়া আবার ঝাঁটাখানা তুলে নিয়ে ঘরের ভেতর পাক খেয়ে বেড়াতে লাগলো। যেন সে নাচছে।

কুঁজোটা কাউন্টার ছেড়ে মাঝখানে এসে দাঁড়ালো।

এবার আমরা ভালো করেই দেখতে পাই, লোকটা সাগর-ঘোরা গোছের কুঁজো। পায়ে স্যাণ্ডেল। পরনে নীল কাপড়ের জেলে-ট্রাউজার,—তার নীচের দিকটা উলটানো। গায়ে রোবে-স্পীয়ার মার্কা গলা-খোলা শার্ট।

লোকটা দরজার কাছে এগিয়ে এলো। সঙ্গে সঙ্গে আমরা দুজনেই পিছিয়ে আসি। যেন একই কথা ভেবে। কুঁজোটা কাচের পাল্লা খুলে ভেতর থেকে খরখড়ি টেনে নামিয়ে দেয়।

আমি উত্তেজিত হয়ে পড়েছি। সেটা লুকোনোর জন্যে বললাম, এমন কাণ্ডের কথা কেউ কখনো ভাবতে পেরেছি?

পালোম্বি জবাব দিলো, না।

তার গলায় এমন একটা তেতো ভাব, যা আমাকে অবাক করে দিলো।

এবার দুজনে গ্যারেজে চলে গেলাম।

বাকী রাতটুকু কাটলো লরিখানা রাস্তায় তুলতে আরচামড়া গুলো

লরিতে উঠিয়ে নিতে।

কিন্তু ভোরবেলা, আমরা যখন রোমের দিকে এগুচ্ছি, পালোম্বি রীতিমতো কথা কইতে শুরু করলো! তার সাথে আমার পরিচয় হওয়ার পর বলতে গেলে এই প্রথম,—দেখলে, ওই ইতালিয়া খানকীটা আমার কি করেছে?

আমি অবাক হয়ে শুধালাম, মানে?

পালোম্বি তার স্বভাবগত ধীর, নীরস গলায় বলতে লাগলো, আমাকে এতো কথা কইবার পর কিনা এই কাণ্ড! আসতে যেতে সারাক্ষণ আমার হাত ধরে রাখতো। আমি বলেছিলাম, ওকে বিয়ে করবো। আসলে, বিয়ের কথা এক রকম পাকাই হয়ে গিয়েছিলো, বুঝলে কিনা। তার পরও! একটা কুঁজো!

তার কথায় আমার দম আটকে আসছিলো। আমি কোনো জবাব দিলাম না।

পালোম্বি বলতে থাকে, আমি ওকে এতো সুন্দর সুন্দর উপহার দিয়েছি! একটা প্রবালের হার, একখানা সিল্কের রুমাল, পেটেন্ট লেদারের এক জোড়া জুতো—। তোমাকে সত্যি কথাই বলছি, ওকে আমি বাস্তবিকই ভালোবেসেছিলাম। ও ছিলো ঠিক আমার মনের মতো মেয়ে।··· অকৃতজ্ঞ, হৃদয়হীন খানকী। এছাড়া আর কি?

এসব চললো বেশ কিছুক্ষণ। আমরা ভোরের ফ্যাকাসে আলোয় ঘটর ঘটর করতে করতে রোমের দিকে চলেছি। এমনি পরিবেশে সে কথা বলতে থাকে। আস্তে আস্তে। আর, যেন আপন মনে এমনি করে।

তাহলে—আমি না ভেবে পারিনে,—ইতালিয়া আমাদের

দুজনাকেই বোকা বানিয়েছে। শুধু রেলের টিকেট বাঁচাবার জন্যে! পালোম্বির কথা শুনে আমার গা জ্বলে যাচ্ছিলো। সে কিনা ঠিক সেই সব কথা বলছে, যা বলতে পারতাম আমি। যার প্রায় কথা কইবার ক্ষমতাই ছিলো না, তার মুখে এসব শুনলে হাসিও পায়।

মেজাজটা আমার দারুণ তিরিক্ষি হয়ে গিয়েছিলো। হঠাৎ রুঢ় গলায় তাকে বলে ফেললাম, দোহাই খোদার, আমার কাছে আর ওই হাড়ের পোঁটলাটার কথা বলিসনে। আমি এখন ঘুমোতে চাই।

বেচারা পালোম্বি! সে জবাব দিলো, যা-ই বলো, বুঝলো কিনা, —কিছু কিছু ব্যাপারে মনে আঘাত লাগে।

এরপর কয়েক মাস সে সারাক্ষণ মনমরা হয়ে রইলো।

আর, আমার জন্যে সড়কটা আবার হয়ে গেছে আগের মতো। তার শুরুও নেই, শেষও নেই। ওটা শুধু একটা নীরস এ্যাসফল্টের ফিতে। যা দিনে দু'বার গিলতে আর উগরাতে হয়।

শেষ পর্যন্ত অবশ্যি একটা ব্যাপার আমাকে পেশা পালটাতে বাধ্য করে। সেটা হচ্ছে: ইতালিয়া ঠিক নেপলস যাওয়ার পথের ওপর একটা মদের দোকান খুলেছে আর তার নাম দিয়েছে লরি ড্রাইভার বিশ্রামালয়।

বাস্তবিক, চমৎকার বিশ্রামালয়! শত শত মাইল পাড়ি দিয়ে এসে ওঠবার মতো।

স্বাভাবিক কারণেই আমরা কখনো ওখানে উঠিনে। তবু দেখতে পাই, ইতালিয়া কাউন্টারের ওপাশে দাঁড়িয়ে আছে। আর, কুঁজোটা তার দিকে বিয়ারের গ্লাস আর বোতল এগিয়ে দিচ্ছে।

এসব দেখলে আমার মনে ব্যথা লাগে।

আমি তাই সরে পড়ি।

লরিখানা কিন্তু এখনো ওই পথে চলাচল করছে। যার উইণ্ড স্ক্রীনে লেখা আছে, ইতালিয়া জিন্দাবাদ, আর, হুইলে বসে থাকে পালোম্বি।

———

লু সুন

অতীতের জ্বালা

জু-চুনের জন্যে আমার মনে জমে আছে দারুণ যন্ত্রণা আর অনুশোচনা। এখানে আমি তার কথাই বলতে বসেছি। সেই বেচারীর খাতিরে যেমন, তেমনি আমার নিজের খাতিরেও। বলাটা আমার ক্ষমতায় কুলোবে কিনা, তা অবশ্যি জানিনে।

হোস্টেলের এক বিস্মৃত কোণে পড়ে থাকা এই জীর্ণ কামরাটি বড়ো নিঝঝুম, বড়ো ফাঁকা। সময় বাস্তবিকই পাখীর মতো উড়ে চলে। আমি যখন জু-চুনের প্রেমে পড়ি, তারপর দেখতে দেখতেই পুরো একটা বছর পার হয়ে গেছে! জু-চুনের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। তাকে ভালোবাসার ফলেই আমি একদিন এই গোরস্তানসুলভ স্তব্ধতা আর শূন্যতার হাত থেকে মুক্তি পেয়েছিলাম।

আমি যখন এখানে ফিরে আসি, দুর্ভাগ্যক্রমে শুধু এই কামরাটিই খালি ছিলো। কামরাটি আগে যেমন দেখেছি, এখনো ঠিক তেমনিই আছে। একটা জানলা ভাঙা, ওপাশে একটা আধমরা কড়ই গাছ, বাইরের দেয়ালে বুড়ো উইস্টারিয়া, ভেতরে এক-

খানা চৌকো টেবিল। দেয়ালটা আর তার পাশে পাতা কাঠের খাটখানাও আগের মতোই রয়ে গেছে।

রাত্তিরে আমি খাটখানায় ঘুমোই একা। যেমন ঘুমোতাম জু-চুনের সাথে দিনযাপন শুরু করবার আগে। মাঝখানের একটি বছর একেবারে মুছে গেছে। যেন এটা আদৌ আসেনি—এবং আমি যেন কখনো এই জীর্ণ কামরাটি ছেড়ে দিইনি বা চিচাও স্ট্রীটের একটি বাড়ীতে অফুরন্ত আশা নিয়ে একটা ছোট্টো নীড় বাঁধিনি। শুধু এই-ই নয়। এক বছর আগে এ-কামরার নীরবতা এখানকার শূন্যতা ছিলো অন্যরকম। তখন প্রায়ই এসব ভরে রেখেছে একটা আশাময় প্রতীক্ষা।

আমি তখন জু-চুনের পথ চেয়ে বসে থাকতাম। *দীর্ঘ প্রতীক্ষায়*, অস্থিরতার ভেতর সময় কাটে। তারপর এক সময় ইট-বাঁধানো চত্বরে হাই হীলের খট খট আওয়াজ শোনা যায়। সঙ্গে সঙ্গে আমি এক বিদ্যুৎস্পর্শে নতুন করে সঞ্জীবিত হয়ে উঠি। অবশেষে তার ফ্যাকাসে গোলগাল মুখখানা দেখা যায়। মৃদু হাসিতে গালে টোল পড়া। হাত দুখানা সরু এবং সাদা। গায়ে সূতীর ব্লাউজ, পরনে কালো স্কার্ট। সে আমাকে দেখাবার জন্যে আধমরা কড়ই গাছটার একটা নতুন পাতা নিয়ে আসে। নয়তো এক থোকা বেগনী ফুল। বুড়ো উইস্টারিয়া লতাটির ঝুলে থাকা ডাল থেকে ভেঙে যে-লতাটির গুঁড়িটাকে মনে হয় লোহার তৈরী!

কিন্তু এখন আছে শুধু পুরোণো সেই নিস্তব্ধতা, আগেকার সেই শূন্যতা। জু-চুন আর আসবে না,—কখনো না, কোনো দিন না।

জু-চুন এখানে না থাকলে এই জীর্ণ কামরাটির কিছুই আমার

চোখে পড়তো না। এসব সময়ে [illegible] একঘেয়েমি কাটা-বার জন্যে আমি হাতে তুলে নিয়েছি একখানা বই। বিজ্ঞান অথবা সাহিত্যের,—আমার কাছে তখন দুই-ই সমান। বইখানা ক্রমাগত পড়েও গেছি। কিন্তু সবই বৃথা। ডজনখানেক পাতা ওলটাবার পর এক সময় টের পেয়েছি, যা-ই পড়ি না কেন, একটা অক্ষরও মাথায় ঢোকেনি।

তখন সজাগ থাকতো শুধু আমার কান দুটি। অতি সজাগ। ফটকের বাইরের একটি পায়ের শব্দও তাই আমার কান এড়াতো না। জু-চুনের পায়ের শব্দ তো অবশ্যই। তার পায়ের আওয়াজ পেলে প্রায়ই আমার মনে হয়েছে, শব্দটা ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে। কাছে, আরো কাছে। কিন্তু তারপরই যেন ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে। এবং অবশেষে মনে হয়, আর সবার পায়ের শব্দের ভীড়ে মিশে গেছে।

এসবের ভেতর একজনের পায়ের শব্দে আমার রীতিমতো ঘেন্না লেগেছে। খানসামার ছেলেটার। যার পায়ে থাকতো কাপড়ের সোল-লাগানো জুতো। প্রতিবেশিনী চটুল মেয়েটিকেও আমার কখনো ভালো লাগেনি। যার মুখে লেপটানো থাকতো ক্রীম। তার পায়ে প্রায়ই দেখা গেছে চামড়ার নতুন জুতো। আর, তার পায়ের শব্দ ছিলো একদম জু-চুনের পায়ের শব্দের মতো।

জু-চুনের রিকশা উলটে পড়েনি তো? নাকি, সে ট্রামে ধাক্কা খেলো!

শেষ পর্যন্ত আমি ভাবতে থাকি, এবার টুপিটা মাথায় চাপিয়ে বেরিয়ে পড়া যাক। তার সাথে দেখা করে আসি। তবে

কিনা—তার কাকা আমার মুখের ওপর গালাগালি দিয়েছিলেন।

হঠাৎ তার প'য়ের আওয়াজ পাওয়া যায়। ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে। আমি তার জন্যে বেরিয়ে পড়তে পড়তেই দেখি, সে এরই মধ্যে উইস্টারিয়ার মাচানটা পার হয়ে এসেছে। মুখে টোল-পড়ানো হাসি। আসলে বোধ হয় কাকার বাড়ীতে কেউ তার সাথে খ'রাপ ব্যবহার করে না।

এবার আমি ঠাণ্ডা হই। দুজনে মুহূর্তখানেক নীরবে, অপলক চোখে পরস্পরের দিকে চেয়ে থাকি। তারপর জীর্ণ কামরাটি আমার কথায় কথায় ভরে ওঠে। যখন আমি পরিবারের জুলুমের প্রতিবাদ করি। এবং পুরোণো রীতিপ্রথা ভেঙে ফেলা দরকার বলে যুক্তি বেড়ে বক্তৃতা জুড়ি। সেই সঙ্গে নারী-পুরুষের সাম্যের কথা বলি। ইবসেন, রবীন্দ্রনাথ আর শেলি নিয়ে আলোচনা করি।

আমি যখন কথা বলি, সে শুধু মাথা দোলায়। মুখে এক ফালি হাসি নিয়ে। আর, চোখ দুটিতে শিশুসুলভ এক বিস্ময় ভরে।

দেয়ালে পেরেক ঠুকে আটকানো রয়েছে শেলির একখানি আবক্ষ ছবি। ছাপানো। একখানা সাময়িক পত্রিকা থেকে কেটে নেয়া। তাঁর সবচেয়ে ভালো ছবিগুলির একটি। কিন্তু আমি যখন ছবিখানির দিকে ইঙ্গিত করি, জুচুন শুধু একবার দ্রুত চোখ বুলিয়ে নেয়। তারপর তার মাথাটা নুয়ে পড়ে। যেমন সে বিব্রত। এসব বিষয়ে সে বোধ হয় পুরোণো ধ্যান-ধারণার মায়া পুরোপুরি কাটাতে পারেনি।

পরে আমার মনে হয়েছে, শেলির এই ছবিখানা সরিয়ে ফেলে অন্য ছবি দেওয়া দরকার। সেখানায় দেখা যায়, তিনি

সমুদ্রে ডুবে যাচ্ছেন। কিংবা দরকার হ্যামলেটের কোনো প্রতিকৃতি। কিন্তু ছবি পালটানো আমার কোনো দিনই হয়ে ওঠেনি।

এবং এখন শেলির সেই পুরোণো ছবিখানাও নেই।

: আমার মালিক আমি নিজে। ওঁদের কারো আমার ব্যাপারে নাক গলাবার কোনো অধিকার নেই।

জু-চুন এটা ঘোষণা করে স্পষ্ট ভাষায়, দৃঢ় গলায় এবং গম্ভীরভাবে। কিছুক্ষণের নীরব চিন্তাভাবনার পর। আমরা তখন তার কাকার কথা আলোচনা করছিলাম। জু-চুনের কাকা এই শহরেই থাকেন। আর, বাবা দেশের বাড়ীতে।

তার সাথে আমার পরিচয় তখন মাস ছয়েকের। এরই মধ্যে আমার সব ধ্যান ধারণার কথাতাকে বলা হয়ে গেছে। আমার জীবনের সকল ঘটনা, আমার সকল দোষত্রুটি-দুর্বলতার কথাও। আমি বিশেষ কিছুই গোপন রাখিনি। এবং সে আমাকে পুরোপুরি বুঝতে পেরেছে।

জু-চুনের ওই সামান্য কটি শব্দ আমার বুকের তলা অবধি নাড়া দিয়ে যায়। কানে বাজতে থাকে দিনের পর দিন,—অনেক কাল ধরে। অনির্বচনীয় এক আনন্দে মনটা ভরে ওঠে। এই কথা জেনে যে, নৈরাশ্যবাদীরা যা-ই বলুন, চীনের মেয়েরা অতোটা অপদার্থ নয়। অদূর ভবিষ্যতেই আমরা তাদের পূর্ণ গৌরবে প্রতিষ্ঠিত দেখতে পাবো।

যখনই জু-চুনের সাথে বাইরে যাই, আমি তার থেকে কয়েক পা পেছনে থাকি। একটি বুড়ো তখন তার মাছের শুঁড়ের মতো গোঁফওয়ালা মুখখানা জানলার নোংরা কাচের গায়ে ঠেকিয়ে রাখে।

আমাদের দুজনের দিকে চোখ ফেলে। মুখখানা সে এতো জোরে চেপে রাখে যে, তার নাকের ডগাটা থেবড়ে যায়। আর, আমরা যখন বাইরের আঙিনা তক গিয়ে পৌঁছই, তখন একটি জানলার ঝলমলে কাচে ফুটে ওঠে একখানা ছোট্টো মুখ। যাতে ক্রীম লেপটানো থাকে। কিন্তু জু-চুন গরবিনীর মতো পা ফেলে এগিয়ে যায়। ডাইনে বাঁয়ে কোনো দিকে না চেয়ে। তাই, কোনো মুখই তার চোখে পড়ে না। আর, সে চলে যেতেই আমিও গর্বভরে পা ফেলে ফিরে আসি।

: আমার মালিক আমি নিজে। ওদের কারো আমার ব্যাপারে নাক গলাবার কোনো অধিকার নেই।

এ-বিষয়ে জু-চুন তার মন একেবারে ঠিক করে ফেলেছিলো। সব কিছু খুঁটিয়ে দেখবার অভ্যেস আমাদের দুজনের মধ্যে তারই বেশী, তার মনই বেশী শক্ত। আমার থেকে অনেক গুণ। আধা শিশি ক্রীম বা থ্যাবড়ানো নাকের ডগাকে তার পরোয়া কিসের ?

এখন আর আমার স্পষ্ট করে মনে পড়ে না, তাকে আমার আন্তরিক, আবেগভরা ভালোবাসাটার কথা কিভাবে জানিয়েছিলাম। না, শুধু এখন কেন ? ঘটনাটা যখন ঘটে যায়, তার পরক্ষণেও তো আমার ধারণাটা ছিলো দারুণ ঝাপসা। এসব নিয়ে আমি রাত্তিরে মনে মনে নাড়াচাড়া করি। তখন জু-চুনকে বলা আমার কথাগুলোর দু'চারটে টুকরো মনে পড়ে। আমরা যখন এক সঙ্গে থাকতে শুরু করি, তার এক মাস দু'মাসের মধ্যেই এই টুকরো কথাগুলোও হারিয়ে গেছে। একেবারে স্বপ্নের মতো নিঃশেষে। আমার শুধু মনে পড়ে, ঘটনাটার প্রায় দু'সপ্তাহ আগেই

খুব সাবধানে ভেবেচিন্তে ঠিক করে রেখেছিলাম, কথাগুলো বলবার সময় কি রকম ভাব দেখাতে হবে। কি বলা দরকার, তাও আমি তৈরী রাখি। প্রত্যাখ্যান যদি আসে, তাহলে আমার কর্তব্য কি হবে, সেটাও স্থির করে ফেলি। কিন্তু আসল সময় যখন এলো, কোনো কিছুই কাজে লাগলো না। নার্ভাস হয়ে গিয়ে আমি তখন সিনেমায় দেখা পন্থা ধরি।

এসব মনে পড়লে এখন আমার দারুণ লজ্জা লাগে। তবু অন্ততঃ এই ব্যাপারটা আমার স্পষ্ট মনে আছে। এমনকি, আজও এটা আমার কাছে অন্ধকার ঘরের একমাত্র প্রদীপের মতো। তার আলোতে দেখতে পাই, জলভরা চোখে জ-চুনের হাত জড়িয়ে ধরে আমি একখানা হাঁটু ভেঙে দাঁড়াচ্ছি।

সে সময়ে জু-চুনের প্রতিক্রিয়া কেমন হয়েছিলো, তাও আমি ভালো করে দেখিনি। আমি শুধু একটি কথাই বুঝেছি : সে আমার প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। তবে, আমার যেন মনে পড়ে, প্রথমে তার মুখখানা ফ্যাকাসে হয়ে যায়। তারপর ক্রমে ক্রমে ঝলমলে লাল। এতো লাল তার মুখ আমি আর কখনো দেখিনি। এর আগেও না, পরেও। তার ছেলেমানুষের মতো চোখ দুটিতে তখন একই সাথে ঝলক দিয়েছে হর্ষ এবং বিষাদ। যার সাথে মেশানো ছিলো ভয়। এবং সে তখন আমার অপলক দৃষ্টিটাকে প্রাণপণে এড়িয়ে যেতে চাইছে। ভাবখানা এমনি, যেন সে দিশেহারা। জানলা দিয়ে উড়ে বেরিয়ে যেতে পারলে বাঁচে। তখনই আমি বুঝে ফেলি, সে রাজী। সে কি বলেছিলো কিংবা আদৌ কিছু বলেছিলো কিনা, তা আমি বুঝতে পারিনি।

কিন্তু জু-চুনের সব কিছুই মনে ছিলো। আমি যা একনাগাড়ে

বলে গিয়েছিলাম, তার সমস্ত কথা সে আওড়াতে পারতো। যেন সে কথাগুলো মুখস্থ করে রেখেছে। আমার সকল কাণ্ডের সে সবিস্তারে বর্ণনা দিতো। একেবারে বাস্তব করে। যেন সে আমার চোখের সামনে একটি ছায়াছবি দেখিয়ে চলেছে। আমার চিত্রায়িতপ্রায় এই অপকীর্তিগুলির মধ্যে থাকতো, স্বাভাবিকভাবেই, সিনেমার সেই জোলো দৃশ্যটিও। যেটি আমি ভুলে যেতে পারলে বাঁচি। রাত্তিরে, যখন চারদিক নিঝঝুম হয়ে এসেছে, তখন আমরা শুরু করেছি পেছনের কথার পর্যালোচনা। কাজটির জন্যে ওইটিই ছিলো আমাদের প্রকৃষ্ট সময়। জু-চুন তখন আমাকে প্রায়ই জেরা এবং পরীক্ষা করেছে। নয়তো তার হুকুম হত, সেদিন তুমি যা যা বলেছিলে, সব আবার বলে যাও। কিন্তু আমার কথায় প্রায়ই ফাঁক পড়েছে। সেগুলি সে-ই পূরণ করে দিতো। আমার ভুলভ্রান্তি শোধরানোসহ। যেন আমি একটা 'ডি' গ্রেডের ছাত্র!

আমাদের এই পর্যালোচনা ক্রমে ক্রমে কমে গেছে, হয়ে উঠেছে কালেভদ্রের ব্যাপার। কিন্তু মাঝে মাঝে সে অপলক, আবিষ্ট চোখে শূন্যের দিকে চেয়ে থাকে। তখন তার মুখে নেমে আসে একটা নরম ছায়া। এবং গালে টোল পড়ে। এসব সময়ে আমি নির্ঘাত বুঝতে পারি, সে সেই পুরোণো ব্যাপারে ফিরে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে আমার ভয় লাগে, সে সিনেমা থেকে তুলে আনা আমার সেই হাস্যকর কাণ্ডটা দেখতে পাচ্ছে। যদিও আমি জানি, এটা তার অবশ্যই দেখা। কিন্তু দেখতে সে আবার চায়, রীতিমতো জিদ ধরে।

তবে, দৃশ্যটা তার কাছে হাস্যকার লাগে না। কেবল আমার কাছে এটা হাস্যকর। এমনকি, ঘেন্নার ব্যাপারও। কিন্তু তার কাছে আদৌ তেমন কিছু নয়। এবং এর কারণ, আমি যা বুঝি, সে

আমাকে একেবারে অন্তর দিয়ে, গভীর আবেগভরে ভালোবাসে।

গত বছরের বসন্তকালটা ছিলো আমাদের জীবনে সবচেয়ে সুখের। এবং সবচে য় ব্যস্ততার। আমি তখন আগের থেকে শান্ত হয়ে গেছি। যদিও মনের একটা অংশ শরীরটার মতোই ব্যস্ত ছিলো। এটা ঘটে তখন, যখন আমরা এক সাথে বাইরে বেরুতে শুরু করি। দুজনে বারকয়েক পার্কে যাই। কিন্তু তার চেয়েও বেশী বেরোই বাসা খুঁজতে।

রাস্তায় বেরুলে লোকে আমাদের দিকে সন্ধানী চোখে চেয়ে থাকে। নয়তো তাদের মুখে ফুটে ওঠে ব্যঙ্গের হাসি। কিংবা চোখে ঝলকায় কামনা আর অবজ্ঞার দৃষ্টি। সবই আমি বুঝতে পারি। এবং তাতে আমার সারা শরীর শিউরে উঠতে চায়। যদি আমি সতর্ক না থাকি। নিজেকে সামলে রাখার জন্যে সর্বক্ষণ আমাকে একটা বর্ম পরে থাকতে হয়। আমার আহমিকা আর অবজ্ঞার।

জু-চুনের কিন্তু আদৌ কোনো ভয়ডর নেই। এসব ব্যাপারে সে একেবারেই অভেদ্য। সে ধীরে ধীরে পা ফেলে হাঁটতে থাকে। অতি শান্তভাবে। যেন তার চোখের সামনে লোকজন বলতে কিছুই নেই।

বাসা পাওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই লোকে আমাদের কোনো না কোনো ছুতোয় ফিরিয়ে দেয়। কোনো কোনো বাসা আমাদের পছন্দ হয় না। সুবিধাজনক নয় বলে। গোড়ার দিকে আমরা ছিলাম দারুণ খুঁতখুতে। কিন্তু অতিরিক্ত খুঁতখুতে নয়। কেননা, আমরা দেখেছি, বেশীর ভাগ বাসাই যেন ঠিক তেমনটি নয়, যেখানে আমাদের পক্ষে বাস করা সম্ভব।

পরে অবশ্যি আমরা চাইতাম, লোকে শুধু আমাদের মেনে নিলেই চলবে।

দুজনে বাসা দেখেছিলাম বিশটির ওপর। তারপর, অবশেষে, কাজ চালাবার উপযোগী সেই বাসাটি পাওয়া যায়। চিচাও স্ট্রীটে একটি ছোট্টো বাড়ী, তার উত্তরমুখী দুটি কামরা। বাড়ীটার মালিক একজন ছোটো অফিসার। তিনি অফিসার হিসেবে ছোটো, কিন্তু মানুষটি বুদ্ধিমান। শুধু মাঝখানের আর পাশের কামরাগুলো নিয়ে ওই বাড়ীতেই থাকেন। তাঁর সংসারে আছেন স্ত্রী, মাস কয়েকের একটি বাচ্চা আর দেশ থেকে আনা একটি চাকরানী। বাচ্চাটা যদি না কাঁদে-টাদে, বাড়ীটা হবে খুব শান্ত।

আমাদের আসবাবপত্র সাদামাটা। কিন্তু আমি যে টাকাপয়সা যোগাড় করেছিলাম, এতেই তার বেশীর ভাগ চলে যায়। জু-চুন তার একমাত্র সোনার আংটিটা বেচে ফেলে। সেই সঙ্গে দুল জোড়াও। আমি বাধা দিতে চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু সে জিদ ধরে। সুতরাং এ নিয়ে পীড়াপীড়ি করিনি। আমি বুঝতে পেরেছিলাম, আমাদের সংসারে তার যদি কোনো অবদান না থাকে, সে স্বস্তি পাবে না।

সে ইতিমধ্যেই চাচার সাথে ঝগড়া করেছে। আসলে ভদ্রলোক ভয়ানক রেগে গিয়েছিলেন। এখন তাই তাকে ত্যাগ করেছেন। এদিকে, আমার কয়েকজন বন্ধুর সাথে ছাড়াছাড়ি হয়। এই বন্ধুদের ধারণা ছিলো, তারা আমাকে সৎ পরামর্শ দিয়ে থাকে। কিন্তু আসলে তারা আমাকে ভয় করে। নয়তো আমার ব্যাপারে ঈর্ষান্বিত। তবু এসবের অর্থ দাঁড়ায় এই যে, আমরা বেশ নির্ঝঞ্ঝাটে আছি।

আমি যখন অফিস থেকে বেরোই, তখন সন্ধ্যে হয়-হয়। তার ওপর, রিকশাওয়ালা চলে শম্বুক গতিতে। তবু, দুজনে এক সাথে কাটাবার মতো কিছুটা সময় ঠিকই পাই। প্রথমে দুজনে নীরবে পরস্পরের দিকে চেয়ে থাকি। তারপর হাত পা এলিয়ে আয়েশ করা আর ঘনিষ্ঠ হয়ে কথা বলা। সবশেষে আবার নীরবতা। তখন আমাদের মাথা নুয়ে থাকে, অথচ কেউ বিশেষ কিছু ভাবিনে।

ক্রমে এমন একটা সময় আসে, যখন আমি সংযত মনে এক-খানি বইয়ের মতো করে তাকে পড়ে নিতে পারি। দৈহিক মানসিক দু'দিক থেকেই। মাত্র তিন সপ্তাহেই তার সম্পর্কে আমার অনেক নতুন কথা জানা হয়ে যায়। এবং আমি দুজনের মাঝখানের বেশ কিছু ব্যবধান ঘুচিয়ে দিই। এসব ব্যবধানের কথা আগে আমার জানা ছিলো না। কিন্তু চোখে পড়বার পর দেখা গেছে, এগুলি সত্যিই বাধাজনক ব্যবধান।

যতোই দিন যায়, জু-চুন হাসিখুশী হয়ে ওঠে। কিন্তু সে ফুল ভালোবাসে না। আমি হাট থেকে দুটো ফুলের পট কিনে আনি। কিন্তু চার দিনেই চারাগুলো এক কোনায় মরে পড়ে থাকে। পানির অভাবে আর অবহেলায়। আমার তো সব কিছু দেখবার সময় নেই। সে অবশ্যি জীব-জানোয়ার পছন্দ করে। এই পছন্দটা সে হয়তো পেয়েছে অফিসার-গিন্নীর কাছ থেকে। মাসখানেকেরও কম সময়ের মধ্যে আমাদের সংসারটার কলেবর বেড়ে যায় বিপুলভাবে। বাড়ী-ওয়ালীর এক ডজন মুরগীর বাচ্চা। তাদের সাথেই আঙিনায় মাটি ঠুকরে বেড়ায় আমাদের চারটি ছানা। কিন্তু দুই গিন্নী নিজের নিজের ছানা নির্ভুলভাবে চিনে নিতে পারে, দেখলেই বলে দিতে পারে, কোন্‌টি কার। মুরগীর ছানার পর আসে একটি ফুটকি-

ওয়ালা কুকুর, —হাট থেকে কেনা। আমার বিশ্বাস, আগেও কুক্কুর-টার কিছু একটা নাম ছিলো। কিন্তু জু-চুন তাকে নতুন নাম দেয়, —আ'সুই। আমিও তাকে আ'সুই বলেই ডাকি। যদিও নামটা আমার পছন্দ নয়।

প্রেমের অবিরাম নবায়ন প্রয়োজন, —প্রয়োজন তার বৃদ্ধি এবং সৃজনশীলতা। এসব বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। আমি যখন জু চুনকে একথা বলি, সে সমঝদারের মতো মাথা নাড়ে।

আহা, কি শান্তির আর সুখের ছিলো সেই দিনগুলি!

শান্তি আর সুখ গাঁটছড়া বেঁধে থাকা চাই। এই-ই তাদের অমরত্ব লাভের পথ। আমরা যখন হোস্টেলে ছিলাম, মাঝে মাঝে আমা-দের এটা-ওটা নিয়ে মতভেদ ঘটেছে। কিংবা ভুল বোঝাবুঝি। কিন্তু চিচাও স্ট্রীটে আসবার পর এই সামান্য মতভেদও আর থাকে না। আমরা এখন প্রদীপের আলোয় মুখোমুখি বসে স্মৃতিচারণ করি আর নতুন মিলনের আনন্দে ডুবে যাই,—যে-মিলন এসেছে আমা-দের মতভেদের অবসানে।

জু-চুন আর একটু মোটাসোটা হয়েছে। তার গাল দুটি এখন আরো লাল। দুঃখের বিষয় শুধু এই যে, সে বড়ো ব্যস্ত থাকে। তার সংসারের কাজ একটু খোশগল্প করবারও ফুরসত দেয় না। পড়াশোনা বা বেড়াতে যাওয়া তো দূরের কথা। দুজনে প্রায়ই বলাবলি করি, আমাদের একটা ঝি রাখা দরকার।

আর একটি জিনিষ আমাকে দমিয়ে দেয়। সন্ধ্যেয় আমি যখন ফিরে আসি, তার চোখে ফুটে থাকে একটা অসুখী দৃষ্টি। যাকে

সে লুকোনোর চেষ্টা করে। অথবা মুখে ছড়িয়ে দেয় একটুখানি হাসি। যা তার জোর করে আনা। আমার মনটাকে দমিয়ে দেয় এইটিই বেশী। কিন্তু আমার ভাগ্য ভালো। আমি আবিষ্কার করি, এসবের কারণ অফিসার-গিন্নীর সাথে জু-চুনের গোপন বিরোধ এবং সেই বিরোধের মূলে আছে মুরগীর ছানা। কিন্তু আমাকে সে কেন কিছু বলে না? আর, সবারই তো নিজস্ব সংসার থাকা উচিত। এ-বাড়ীটা আমাদের থাকবার মতো নয়।

আমারও কিছু রুটিন বাঁধা কাজ আছে। সপ্তাহের ছ'টি দিন আমাকে বাসা আর অফিস, অফিস আর বাসা করতে হয়। অফিসের টেবিলে আমার কাজ দলিলপত্র আর চিঠির নকল তৈরি করা। তার কোনো অন্ত নেই। বাসায় আমি জু-চুনকে সঙ্গ দিই। নয়তো চুলো ধরাতে সাহায্য করি। অথবা ভাত রাঁধতে বা রুটি সেঁকতে। এখন আমি রান্নাবান্না শিখে ফেলেছি।

তবু, যখন হোস্টেলে ছিলাম, এখন আমি তার থেকে অনেক ভালো খাই। রান্না করাটাই অবশ্যি জু-চুনের আসল ব্যাপার নয়। রান্নায় সে মনপ্রাণ ঢেলে দেয়। এ-ব্যাপারে তার উদ্বেগের অন্ত নেই। তাই দেখে আমিও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ি। তাতে দুজনেই ভালো-মন্দ ভাগ করে নিই। রান্নায় সে খাটে বড়ো বেশী। এবং সারাটি দিন। ঘামে তার খাটো চুলগুলি মাথার সাথে লেপটে যায়। হাত দুখানা হয়ে ওঠে খসখসে।

এবং এরপর আছে আ'সুই আর মুরগীর বাচ্চাগুলোকে খাওয়ানো। এটা আর কারো দ্বারা সম্ভব নয়।

আমি তাকে বলি, তোমার এমন হাড়ভাঙা খাটনি আর দেখতে পারিনে। এর চেয়ে আমার না খেয়ে থাকা ভালো।

আমার কথা শুনে সে শুধু নীরবে আমার দিকে চেয়ে থাকে। অপলক চোখে, যেন চিন্তিতভাবে। আমার তখন আর কিছু বলা হয় না। কিন্তু তার খাটনি আগের মতোই চলতে থাকে।

অবশেষে সেই অঘটনটা ঘটেই যায়। আমি যার ভয় করছিলাম।

উলটো দশম পরবের আগের দিন সন্ধ্যেবেলা। আমি আলসের মতো বসে আছি। জু-চুন থালাবাসন মাজছে। এমন সময় দরজায় কে যেন কড়া নাড়লো। উঠে গিয়ে দরজা খুলে দেখি, আমাদের অফিসের পিয়ন। সে এক টুকরো মিমিয়োগ্রাফ করা-কাগজ আমার দিকে বাড়িয়ে দেয়। অনুমানেই বুঝতে পারি, জিনিসটা কি। তারপর আলোর কাছে ধরতেই ব্যাপারটা একদম পরিষ্কার হয়ে যাই। টুকরোটায় লেখা রয়েছে,—

কমিশনারের আদেশক্রমে শি চুয়ান-শেঙকে বরখাস্ত করা হল।

সচিবালয়
৯ই অক্টোবর

এমনটি যে ঘটবে, আমি আগেই বুঝতে পেরেছিলাম। আমরা যখন হোস্টেলে থাকি, তখনই। সেই ক্রীমওয়ালী ছিলো জুয়োর আড্ডায় কমিশনারের ছেলের এক বান্ধবী। সে নিশ্চয়ই গুজব রটিয়েছে এবং হাঙ্গামা বাধাবার চেষ্টা করেছে। এছাড়া তার তো আর কিছু করবার ক্ষমতা ছিলো না। আমি শুধু এই ভেবে অবাক হই যে, এটা আরো আগে কেন ঘটেনি!

আসলে এটা কোনো অঘটনই নয়। কেননা, আমি আগেই ভেবে রেখেছি, অন্য কোথাও একটা চাকরি নেব। কেরানীগিরি

বা মাস্টারি। কিংবা -যদিও কাজটা এর থেকে আর একটু কঠিন, কিছু অনুবাদ করতে পারি। 'স্বাধীনতাসুহৃদ্'-এর সম্পাদকের সাথে আমার পরিচয় আছে। মাস দুয়েক আগে তাঁর সাথে চিঠি লেখালেখিও হয়েছে।

কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার বুকখানা ধড়ফড় করতে থাকে। আমি সবচেয়ে দুঃখ পাই এই ভেবে যে, জু-চুনের মুখখানাও ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। যদিও ভয়ডর কাকে বলে, ও-মেয়ে জানে না। ইদানীং সে একটু দুর্বল হয়ে পড়েছে।

মুখে সে বলে, এতে কি এসে যায়? আমরা নতুন করে জীবন আরম্ভ করবো। নাকি বলো? আমরা—

কথাটা সে শেষ করে না। এবং তার গলাটা নির্জীব লাগে। প্রদীপের আলোটা যেন অস্বাভাবিক ভাবে ক্ষীণ। মানুষ বাস্তবিকই হাস্যকর জীব। সামান্য ব্যাপারেও সে এতো সহজে ভেঙে পড়ে!

দুজনে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে পরস্পরের দিকে চেয়ে থাকি। কারো মুখে কোনো কথা নেই। তারপর শুরু হয় ইতিকর্তব্য নিয়ে আলোচনা।

অবশেষে ঠিক করি, হাতে যে পয়সাকড়ি আছে, তাই দিয়েই দুজনে দিন চালাবো। যতো দূর সম্ভব কম খরচে। এবং কেরানীগিরি বা মাস্টারির জন্যে কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দেওয়া দরকার। সেই সঙ্গেই 'স্বাধীনতাসুহৃদ্'-এর সম্পাদকের কাছে একখানা চিঠি লিখতে হবে। আমার বর্তমান পরিস্থিতির কথা বলে—এবং আমাকে এই বিপদ থেকে মুক্তি পেতে সাহায্য করবার জন্যে আমার একটি অনুবাদ প্রকাশের অনুরোধ জানিয়ে।

: যেমন কথা, তেমনি কাজ। এসো, আমরা নতুন করে জীবন আরম্ভ করি।

আমি এবার সোজা টেবিলে গিয়ে বসি। ডালডার বয়াম আর সিরকার বাটিটা ঠেলে এক পাশে সরিয়ে রাখি। জু-চুন মিটমিটে আলোটা নিয়ে আসে। প্রথমে আমি বিজ্ঞাপনের খসড়াটা করে ফেলি। তারপর অনুবাদের জন্যে একখানি বই নির্বাচন। (হোস্টেল ছেড়ে আসা অবধি আমার বইগুলির দিকে কখনো তাকাইনি। প্রত্যেকখানি বইয়ের গায়ে ধুলোর চর পড়ে আছে।) সবশেষে চিঠিখানা লেখা হল।

চিঠির ভাষা কেমন হবে, তাই নিয়ে আমার মনে কিছু দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছিলো। সেসব কাটাতে বেশ খানিকটা সময় লাগে। ভাববার জন্যে একবার একটুখানি থামি। ঝাপসা আলোয় তখন ক্ষণেকের জন্যে জু-চুনের ওপর চোখ পড়ে। আবার তাকে দারুণ বিষণ্ণ দেখায়। তার মতো শক্ত আর ভয়ডরহীন মেয়েকে এমন তুচ্ছ ব্যাপার এতো বদলে দেবে, এ আমি কখনো ভাবতেও পারিনি। জু-চুন ইদানীং বাস্তবিকই বেশ দুর্বল হয়ে পড়েছে। এর কারণ শুধু এই ব্যাপারটি নয়,—যার শুরু আজ সন্ধ্যায়। এতে আমি আরো নিভে যাই। হঠাৎ আমার চোখের সামনে ফুটে ওঠে এক অশান্তিময় জীবনের ছবি। যেন এক বিদ্যুৎঝলকের মতো। সে-ছবি হোস্টেলে আমার এই জীর্ণ কামরাটির অশান্তির। দৃশ্যটি আমি একবার ভালো করে দেখে নিতে যাই। কিন্তু বৃথা চেষ্টা। পরক্ষণেই দেখতে পাই, আমি প্রদীপের ঝাপসা আলোর সামনে বসে আছি।

চিঠিখানা শেষ করতে অনেক সময় লেগে যায়। খুব লম্বা

চিঠি। শেষ করবার পর বড়ো ক্লান্তি লাগে। বুঝতে পারি, ইদানীং আমি নিজেও আগের চেয়ে দুর্বল হয়ে পড়েছি।

দুজনে স্থির করি, বিজ্ঞাপনটা কালই কাগজে পাঠাবো এবং সেই সঙ্গেই চিঠিখানা ডাকে দেব।

তারপর, কেউ কোনো কথা বলিনে, কিন্তু একই সঙ্গে সোজা হয়ে বসি। যেন দুজনেই দুজনের শক্তি এবং সহিষ্ণুতার কথা জানি। এবং এই নবতর সূচনায় নতুন আশার সঞ্চার দেখতে পাই।

বাইরের এই আঘাতটি আমাদের মনে সত্যিই এক নতুন উদ্দীপনা এনে দেয়। অফিসে আমি ছিলাম খাঁচায় বন্দী বুনো পাখীর মতো। যাকে তার বন্দীকারী দানাপানি দিতো ঠিকই। কিন্তু এমন পরিমাণে, যাতে শুধু প্রাণটা বাঁচে, মোটাতাজা হওয়া সম্ভব নয়। কালক্রমে সে তাই পাখা চালানো ভুলে যায়। তখন যদি খাঁচা থেকে কখনো ছাড়াও পায়, ওড়বার ক্ষমতা তার থাকে না। কিন্তু সে যা-ই হোক, আমি খাঁচা থেকে বেরিয়ে এসেছি। আমাকে এখন নতুন করে উদার আকাশে পাখা মেলতেই হবে। এখনো সময় আছে, এখনো আমি পাখা চালাতে পারি।

অবশ্যি, এক চিলতে বিজ্ঞাপন থেকে সঙ্গে সঙ্গে ফল পাবো, এমন আশা আমরা করতে পারিনে। আবার, অনুবাদও অতো সহজ কাজ নয়। আপনি কিছু পড়ে ভাবলেন, সেটা বুঝে ফেলেছেন। কিন্তু তারপর অনুবাদ করতে গেলে পদে পদে অসুবিধা দেখা দেবে। তখন কাজ এগোয় অতি মন্থর গতিতে।

তবু, যথাসাধ্য ভালো অনুবাদ করবার জন্যে আমি উঠে পড়ে

লাগি। সপ্তাহ দুয়েকও পেরোয় না, -তারই মধ্যে মোটামুটি রকমের নতুন একখানা অভিধানের কিনার আমার আঙুলের ছাপে ছাপে কালো হয়ে যায়। আমি কাজটাকে যে অতি সীরিয়াসলি নিয়েছি,এই-ই তার প্রমাণ। 'স্বাধীনতাসুহৃদ'-এর সম্পাদক বলেছিলেন,তাঁর পত্রিকা ভালো পাণ্ডুলিপিকে কখনো হতচ্ছেদ্দা করবে না।

দুর্ভাগ্যের বিষয়, এ-বাসায় এমন একটু জায়গা নেই, যেখানে আমি নির্ঝঞ্ঝাটে থাকতে পারি! জু-চুন এখন আর আগের মতো শান্ত নয়—কিংবা বুদ্ধি বিবেচনা করে কাজ করে না। আমাদের কামরাটা থালাবাসনে এমনি ঠাসা, ধোঁয়ায় এমনি ভরা যে, এখানে অবিচল মনে কাজ চালিয়ে যাওয়া অসম্ভব। অবশ্যি, এর জন্যে—আর কেউ নয়,—আমিই দায়ী। একটা পড়বার ঘরের ব্যবস্থা করতে পারিনি, এটা আমারই দোষ। এসবের ওপর আবার রয়েছে আ'সুই আর মুরগীর বাচ্চাগুলো। এখন অবশ্যি বাচ্চাগুলো আর বাচ্চা নেই, মুরগী। এবং দুই পরিবারের বিরোধের আরো বড়ো কারণ।

এরপর আছে প্রতিদিনের সেই খাওয়াদাওয়ার ঝামেলা। যার কোনো শেষ নেই। জু-চুনের সব শক্তি বোধ হয় আমাদের খাবার তৈরি করতেই ফুরিয়ে যায়। মানুষ আয়-উপার্জনের জন্যে খায়, খাওয়ার জন্যে তার আয় উপার্জন। এদিকে, আ'সুই আর মুরগীগুলোকেও খাবার দিতে হয়। স্পষ্টই বোঝা যায়, জু-চুন যা কিছু শিখেছিলো, সবই ভুলে গেছে। আমাকে সে যখন খেতে ডাকে, তখন যে আমার চিন্তাধারায় বাধা দিচ্ছে, তাও বুঝতে পারে না। আমি অবশ্যি খেতে বসবার সময় মাঝে মাঝে একটু ঘোঁৎ ঘোঁৎ করি। কিন্তু জু-চুন তা আদৌ গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে

না। একদম নির্বিকারভাবে হাড্ডি চিবুতে থাকে।

নির্দিষ্ট সময়ে খেতে বসবার জন্যে আমার কাজটাকে যে সীমার মধ্যে ফেলা চলে না, এটা বুঝতে তার পাঁচ পাঁচটি সপ্তাহ লেগে গেল। তারপর, যখন বুঝতে পারে, তখন সে বোধহয় বিব্রত হয়। কিন্তু মুখে কিছুই বলে না।

এরপর আমার কাজ আরো জোরেশোরে এগিয়ে চলে। কয়েক দিনের মধ্যেই আমি পঞ্চাশ হাজার শব্দ অনুবাদ করে ফেলি। এখন কাজ শুধু পাণ্ডুলিপিটার পরিমার্জন। তারপরই অন্য দুটি লেখার সঙ্গে 'স্বাধীনতাসুহৃদ'-এ পাঠিয়ে দেওয়া যাবে। সে-গুলোও আমি ইতিমধ্যেই শেষ করে রেখেছি।

খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারটা অবশ্যি এখনো ঝামেলার। খাবার জুড়িয়ে যাক, তার জন্যে পরোয়া নেই। কিন্তু পেট ভরে খাওয়ার মতো খাবারই এখন জোটে না। আমার ক্ষিধে আগের থেকে অনেক কমে গেছে। তার কারণ, আমি সারাদিন ঘরে বসে শুধু মাথার কাজ করি। তবু, সব বেলা থালা ভরে ভাত মেলে না। আ'সুইকে ভাত দিতে হয়। তার সাথে মাঝে মাঝে মাংসও। যে-জিনিষটা ইদানীং আমি নিজেও খাওয়ার সুযোগ পাই কদাচিৎ। জু-চুন বলে, আ'সুই বড্ডো শুকিয়ে গেছে, দেখলে সত্যিই মায়া হয়। আর, এই নিয়ে বাড়ীওয়ালী আমাদের যা তা শোনায়।

জু-চুন ঠাট্টা-বিদ্রূপ সইতে পারে না।

সুতরাং আমার এঁটোকাঁটা খেয়ে থাকে শুধু মুরগীগুলো। যদিও এটা আমি বুঝতে পারি অনেক দিন পর।

তবে, একটা ব্যাপারে আমি সচেতন। হাক্সলির ভাষায়, 'বিশ্বে আমার জায়গা' শুধু কুকুরটি আর মুরগীগুলোর মাঝখানে।

কালক্রমে, অনেক যুক্তিতর্ক আর জেদাজিদির পর, মুরগীগুলো আমাদের খাবার টেবিলে উঠে আসতে থাকে। আমি আর আ'সুই দিন দশেক মজা করে তাদের উপভোগ করি। মুরগীগুলো অবশ্যি খুব শুকিয়ে গিয়েছিলো। তাদের তো অনেক কাল সারা দিনের মধ্যে কয়েক দানার বেশী খাবার জোটেনি।

এরপর জীবনটা আগের তুলনায় অনেক অনেক শান্তিময় হয়ে ওঠে। শুধু, জু চুন বড্ডো মুষড়ে পড়ে। মুরগীগুলো না থাকায় তাকে বড়ো বিষণ্ণ দেখায়, তার দারুণ একঘেয়ে লাগে। সব মিলিয়ে তাকে মনে হয় গোমড়ামুখো। মানুষ এতো সহজে বদলে যায়!

শেষ পর্যন্ত আ'সুইয়ের মায়াও কাটাতে হয়। কোনো জায়গা থেকে চিঠিপত্র পাওয়ার আশা আমরা ছেড়েই দিয়েছি। অনেক দিন যাবৎ জু চুনের পাতে এমন কোনো খাবার পড়ে থাকে না, যা কুকুরটা খেতে পারে বা যার জন্যে পেছনের দু'পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ানো চলে। তাছাড়া, শীত আসছে যেন ঘোড়ায় চেপে কদম তুলে। একটা স্টোভের যে কিভাবে ব্যবস্থা করবো, আমরা ভেবে পাচ্ছিনে। কুকুরটার খাবার জোটানো অনেক আগেই রীতিমতো দায় হয়ে উঠেছে।

সুতরাং তাকেও যেতে হল।

আমরা যদি তার গলায় দাম-লেখা কাগজ ঝুলিয়ে বিক্রির জন্যে তাকে বাজারে নিয়ে যেতাম, তাহলে হয়তো গোটা কতক তামার পয়সা হাতে আসতো। কিন্তু আমাদের দুজনের কেউই ওই কর্মটি করে উঠতে পারিনি।

অবশেষে একদিন তার গলায় এক টুকরো কাপড় জড়িয়ে, তাকে পশ্চিম ফটকের ওদিকে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিলাম। সে

অবশ্যি আমার পিছু নিয়ে ছুট ধরে। কিন্তু আমি তাকে ধাক্কা মেরে একটা গর্তে ফেলে দিই। গর্তটা অবশ্যি তেমন গভীর নয়।

বাসায় ফিরে দেখি, চারদিক এখন আরো শান্তিময়। কিন্তু জু-চুনের করুণ মুখখানা আমাকে রীতিমতো চমকে দেয়। এতো বিষণ্ণ তাকে আমি আর কখনো দেখিনি। তার এই বিষণ্ণতার কারণ অবশ্যই আ'সুই। কিন্তু এতে এতো মন খারাপ করবার কি আছে? আর, কুকুরটাকে গর্তে ফেলে দেওয়ার কথাও তো আমি তাকে বলিনি।

সেদিন রাত্তিরে তার মুখচোখে কেমন জানি একটা ঠাণ্ডা ভাব দেখা গেল।

আমি না বলে পারলাম না, এ কি! তোমার আজ হয়েছে কি, জু-চুন?

সে আমার দিকে তাকালোও না, কি?

ঃ তোমাকে এমন ইয়ে দেখাচ্ছে—

ঃ ও কিছু না,—কিছুই হয়নি।

পরে আমি বুঝতে পারি, সে আমাকে নিষ্ঠুর ভেবেছে। নিশ্চয়ই তাই। আসলে, আমি যখন স্বাধীন ছিলাম, তখন সব কিছুই ভালো-ভাবে চালিয়ে নিয়েছি। যদিও অতিরিক্ত অহমিকার দরুন পারিবারিক সম্পর্ক কারো সাথে বড়ো একটা রাখিনি। কিন্তু হোস্টেল ছেড়ে আসবার পর একদম খাঁচায় আটকা পড়ে যাই। আমার পুরোণো বন্ধুদের কারো সঙ্গে এখন কোনো সম্পর্ক নেই। তবু, একবার যদি এই সব থেকে বেরিয়ে যেতে পারতাম, আমার সামনে অনেক পথ খোলা পেতাম। এখন আমাকে এতো কষ্ট সইতে হচ্ছে প্রধানতঃ জু-চুনের জন্যে। আ'সুইকে বিদায় করেছি

তো এই কারণেই। কিন্তু জু-চুন বোধহয় এখন বড়ো বেশী ভোঁতাবুদ্ধি হয়ে গেছে। যার দরুন এটাও বুঝতে পারে না।

একবার সুযোগ বুঝে তাকে এর একটা ইঙ্গিত দিই। সে মাথা নাড়ে। যেন আমার কথা বুঝেছে। কিন্তু তারপরের হাব-ভাব দেখে মনে হয়, সে বোঝেনি। নয়তো আমার কথা বিশ্বাস করে না।

এক দিকে ঠাণ্ডা আবহাওয়া, আর এক দিকে জু-চুনের ঠাণ্ডা চোখ। দুইয়ে মিলে আমার জন্যে বাসায় শান্তিতে থাকা অসম্ভব করে তোলে। কিন্তু আমি যাবো কোথায়? জু-চুনের ঠাণ্ডা চোখের সামনে থেকে সরে গিয়ে রাস্তায় বা পার্কে ঘুরে বেড়াতে পারি। কিন্তু বাইরের ঠাণ্ডা হাওয়া যেন শিস দিয়ে দিয়ে একেবারে হাড়ে গিয়ে বেঁধে।

অবশেষে আমি আশ্রয় খুঁজে পাই পাবলিক লাইব্রেরীতে।

এখানে ঢুকতে পয়সা লাগে না। তাছাড়া, রীডিং রুমে দুটো স্টোভ আছে। স্টোভ দুটো জ্বলে একদম মরো-মরো হয়ে। তবু, তাদের দেখলেও যেন গা-টা গরম লাগে। আমার পড়বার মতো কোনো বই লাইব্রেরীটায় নেই। পুরোণোগুলো এখন অচল হয়ে গেছে। এবং নতুন বই কার্যতঃ নেই বললেই চলে।

কিন্তু আমি তো সেখানে পড়াশোনা করতে যাইনে। ভেতরে সাধারণতঃ বেশী লোক থাকে না। মাঝে মাঝে অনেক লোক আসে বটে। কিন্তু তখনও ডজনখানেকের ওপর ওঠে না। সবারই পরনে থাকে আমারই মতো হালকা পোশাক। ঠাণ্ডার হাত থেকে বাঁচবার জন্যে আমরা সবাই পড়াশোনার ভান করি।

এতে আমার সব দিক থেকেই সুবিধা। পথে বেরুলেই আপনার এমন সব চেনা-জানা লোকের সাথে দেখা হয়ে যাবে, যারা আপনার দিকে অবজ্ঞার চোখে তাকায়। কিন্তু এখানে ও-ধরণের বালাই নেই। কেননা, আমার পরিচিতজনেরা সবাই অন্য স্টোভের চারপাশ ঘিরে বসে থাকে। নয়তো নিজেদের বাড়ীতে বসে আগুন পোহায়।

এখানে আমার পড়বার মতো বই-টই যদিও নেই, আমি একটা শান্ত পরিবেশ পাই। যেখানে কিছু চিন্তা করা যায়। এই ঘরে একা একা বসে আমি যখন অতীতের কথা ভাবি, তখন মনে হয়, গত ছয় মাসে প্রেমের জন্যে—অন্ধ প্রেমের জন্যে—জীবনের সব জরুরী জিনিষকেই বিসর্জন দিয়েছি। তাদের মধ্যে প্রথম এবং সবচেয়ে জরুরী জীবিকা। এ-জিনিষের আগে জীবনে প্রেমের জায়গা হতে পারে না। যারা সংগ্রাম করে, তাদের জন্যে মুক্তির একটা উপায় চাই। আমি তো এখনো পাখা চালানো ভুলে যাইনি। যদিও এখন আমি আগের থেকে অনেক দুর্বল।

রীডিং রুমটি এবং এর পাঠকরা ক্রমে ক্রমে মিলিয়ে যায়। আমার চোখের সামনে ফুটে ওঠে অন্য কিছু মানুষ। ক্রুদ্ধ সমুদ্রে মাছ-ধরা জেলে, পরিখায় বসা সৈনিক, গাড়ীতে বসা বিশিষ্ট ব্যক্তি, স্টক এক্সচেঞ্জের ফাটকাবাজ পাহাড়ী অরণ্যের বীর, রাত্তিরে বদ মতলবে ঘুরে বেড়ানো লোক, অন্ধকারে গা ঢাকা দেওয়া চোর,—এমনি আরো কতোজন! জু-চুন এখন অনেক দূরে। আ'সুইয়ের জন্যে ক্ষোভে আর হাঁড়ি ঠেলার ব্যস্ততায় তার সব সাহস হারিয়ে গেছে। আশ্চর্যের বিষয়, তাকে তেমন শুকনো দেখায় না!

শীত এখন আরো বেশী। শক্ত কয়লার যে কটি চাংড়া স্টোভের ভেতর ধিকিধিকি জ্বলছিলো, সেগুলো পুড়ে শেষ। এখন লাইব্রেরী বন্ধ করে দেওয়ার সময়। সুতরাং আমাকে চিচাও স্ট্রীটে ফিরে আসতে হল। আবার সেই ঠাণ্ডা চোখের সামনে দাঁড়াতে।

ইদানীং মাঝে মাঝে আমি উষ্ণ ব্যবহার পাচ্ছি। কিন্তু তাতে আমি শুধু আরো মুষড়ে পড়ি। একটা সন্ধ্যের কথা এখনো মনে আছে। সেদিন জু-চুনের চোখে সেই ছেলেমানুষসুলভ দৃষ্টি ঝলক দিয়ে উঠেছিলো। যা আমি অনেক দিন দেখিনি। সে তখন একটু-খানি হেসে হোস্টেলের একটি ঘটনার কথা আমাকে মনে করিয়ে দেয়।

কিন্তু এমনিতে তার চোখে সারাক্ষণ একটা ভয়ের দৃষ্টি ফুটে থাকে। ইদানীং সে আমার সাথে যতোটা ঠাণ্ডা ব্যবহার করেছে, আমি তার চেয়ে বেশী ঠাণ্ডা ব্যবহার করেছি তার সাথে। এর জন্যে সে বিব্রত। তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যে মাঝে মাঝে আমি জোর করে কথা বলি এবং হাসি। কিন্তু সেই হাসি আর কথা শূন্যতায় ভরা। পরক্ষণেই আমার নিজেরই কানে ঘেন্না-উপচানো উপহাসের মতো বাজতে থাকে। এসব আমার কাছে অসহ্য।

জু-চুনও হয়তো এসব বুঝতে পারে। তাই, এরপর তার সেই কাঠ-কাঠ শান্ত ভাবটা আর থাকে না। এবং সে এটা লুকো-বার প্রাণপণ চেষ্টা করে যদিও, তার উদ্বেগটা প্রায়ই ধরা পড়ে যায়। তবে, আমার সাথে তার ব্যবহার এখন আগের থেকে অনেক নরম।

আমি তার সাথে স্পষ্ট ভাষায় কথা বলতে চাই। কিন্তু

সাহসে কুলোয় না। যখনই কথা বলবো বলে মনটাকে তৈরিকরি, ছেলেমানুষসুলভ ওই চোখ জোড়া আমাকে দমিয়ে দেয়। অন্ততঃ তখনকার মতো আমি হেসে ফেলতে বাধ্য হই। কিন্তু সে-হাসি ব্যঙ্গের রূপ নিয়ে সোজা আমাকেই আঘাত হানে। তখন আর আমার ঠাণ্ডা ভাবটা থাকে না।

এরপর সে পুরোণো প্রশ্নগুলো নতুন করে তুলতে থাকে। আমার ওপর নতুন নতুন পরীক্ষা চালায়। তাকে যে আমি ভালোবাসি, তার প্রমাণ স্বরূপ হরেক রকম বানানো জবাব দিতে আমাকে বাধ্য করে। এই কপটতা আমার বুকে বাজে। মিথ্যার ভারে মনটা এমন ভারী হয়ে ওঠে যে, আমার দম আটকে আসে।

মুষড়ে-পড়া দশায় আমার প্রায়ই মনে হয়, সত্যি কথা বলবার জন্যে বাস্তবিকই দারুণ সাহস দরকার। সাহস যার নেই, কপটতার সাথে যে আপোষ করে, সে কখনো নতুন পথের সন্ধান পায় না। তার চেয়েও বড়ো কথা, বেঁচে থাকাই তার পক্ষে সম্ভব নয়।

এরপর জু-চুনকে ক্ষুব্ধ দেখায়।

এটা প্রথম লক্ষ্য করি একদিন সকালবেলা। খুব ঠাণ্ডা এক সকালে। কিংবা হয়তো এমনি অন্য কোনো সময়ে। ঠাণ্ডা রাগ নিয়ে আমি তখন হাসতে থাকি। গোপনে, মনে মনে। যতো দর্শন, যতো বুদ্ধিভরা, ভয়ডরহীন কথা সে শিখেছিলো, সবই তাহলে ফাঁকা!

অথচ এই অসারতাটা তার কাছে ধরা পড়ে না। পড়াশোনা সে অনেক আগেই ছেড়ে দিয়েছে। এখন এই কথাটাও সে বুঝতে

পারে না যে, জীবনের প্রথম প্রয়োজন আয়-উপার্জন। এবং এর জন্যে মানুষকে অন্যের সাথে হাত ধরাধরি করে এগুতে হয়। নয়তো একাই। জু-চুন শুধু একটা কাজই করতে পারে। অন্যের লেজ ধরে থাকা। যাতে এমনকি গোদ্ধার পক্ষেও লড়াই করা কঠিন হয়ে পড়ে এবং দুজনেরই সর্বনাশ হয়।

আমি বুঝতে পারি, এখন আমাদের একমাত্র ভরসা ছাড়াছড়ি। তার একদম সরে যাওয়া উচিত। হঠাৎ এক সময় আমি তার মৃত্যুর কথাও ভাবি। কিন্তু পরক্ষণেই লজ্জা পেয়ে গিয়ে নিজেকেই গালাগালি দিই। সুখের বিষয়, সময়টা এখন সকাল। জু-চুনকে সত্যি কথাটা বলবার প্রচুর অবকাশ এখনো আছে। আমরা নতুন জীবন আরম্ভ করতে পারবো, কি, পারবো না, তা এরই ওপর নির্ভর করছে।

অতীতের প্রসঙ্গ আমি ইচ্ছে করেই তুলি। সাহিত্যের কথা বলি। তারপর বিদেশী লেখকদের আর তাঁদের রচনার কথা। ইবসেনের 'নোরা' আর 'সাগরকন্যা'-র গল্প শোনাই। শক্ত মনের জন্যে নোরার প্রশংসা করি।

এ সব কথাই আমি আগের বছর হোস্টেলের জীর্ণ কামরাটায় বসে বলেছি। কিন্তু এখন এগুলো ফাঁকা শোনায়। আমার মুখ থেকে এক-একটা কথা বেরোয়, আর, একটা সন্দেহ আমাকে আঁকড়ে ধরেঃ একটা অদৃশ্য ভূত আমার পেছন দিকে এসে বিদ্বেষভরে আমার কথাগুলোর পুনরাবৃত্তি করছে। সন্দেহটা আমি কিছুতেই কাটাতে পারিনে।

জু-চুন আমার সব কথাই শোনে। ঘাড় নেড়ে নেড়ে সায়ও দেয়। তারপর একদম চুপ।

আমার যা বলবার ছিলো, হঠাৎ সেরে ফেলি। কথার রেশটা শূন্যতায় ডুবে যায়।

জু-চুন আরো কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর বলে, হ্যাঁ। কিন্তু--চুয়ান-শেঙ, আমার যেন মনে হয়, ইদানীং তুমি অনেক বদলে গেছো। তা—এটা কি সত্যি? বলো তো!

আমি একটা আঘাত পাই। কিন্তু নিজেকে সামলে নিয়ে আমার মতামত আর প্রস্তাবগুলো তাকে বুঝিয়ে দিই: আমাদের নতুন করে জীবন আরম্ভ করতে হবে, যাতে দুজনে এক সাথে মারা না পড়ি। ব্যাপারটা ভালোভাবে তার মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়ার জন্যে দৃঢ় গলায় বলি, এখন আর তোমার কোনো দ্বিধা-সঙ্কোচ থাকা উচিত নয়। তুমি সাহসে বুক বেঁধে এগিয়ে যাও। আমাকে তুমি সত্যি কথা বলতে বলছিলে। হ্যাঁ, আমাদের কোনো ভণ্ডামি থাকা উচিত নয়। ইয়ে—সত্যি কথাটা হল,—এসব বলছি এই জন্যে যে, তোমাকে আমি আর ভালোবাসিনে। আসলে, তোমার জন্যেই এটা বেশী মঙ্গলজনক। কেননা, তুমি আরো সহজে এগুতে পারবে. কোনো আফসোস-টাফসোস করতে হবে না।

ভয় ছিলো, এবার একটা নাটকীয় দৃশ্য দেখতে হবে। কিন্তু দেখলাম শুধু নীরবতা। তার মুখখানা অবশ্যি ছাইয়ের মতো সাদা হয়ে গেল। যেমন দেখায় মড়ার মুখ। কিন্তু মুহূর্তখানেক পরেই স্বাভাবিক রঙটা ফিরে আসে। চোখ দুটিতে সেই ছেলেমানুষী দৃষ্টি ঝলক দিতে থাকে। সে একবার চারদিকে তাকায়। এমন-ভাবে. যেন এক ক্ষুধার্ত শিশু স্নেহময়ী মাকে খুঁজছে। কিন্তু চোখ ঘুরে বেড়ায় শুধু শূন্যে। আমার দৃষ্টিকে সে ভয়ানকভাবে এড়িয়ে চলে।

এ-দৃশ্য আমার কাছে একেবারেই অসহ্য। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয়, এখনো অনেক সময় আছে। আমি হিমেল হাওয়া অগ্রাহ্য করে লাইব্রেরীর দিকে ছুট দিই।

লাইব্রেরীতে গিয়ে 'স্বাধীনতাসুহৃদ'-একটি কপি পাই। তাতে আমার সব কটি ছোটো লেখা ছাপা হয়েছে। লেখাগুলো দেখে আমি অবাক। কিন্তু সেই সঙ্গেই যেন একটা নতুন জীবন পাই। মনে হয়, আমার সামনে অনেক পথ খোলা। এভাবে আর চলতে পারে না।

এবার আমি পুরোণো বন্ধুবান্ধবের কাছে যাওয়া-আসা শুরু করি। যাদের সাথে অনেক দিন কোনো সম্পর্ক ছিলো না। তবে, কারো কাছেই একবার দু'বারের বেশী যাইনে। তাদের ঘরগুলি স্বাভাবিক কারণেই গরম। কিন্তু সেসব জায়গায় গেলেও আমার মনে হয়, ঠাণ্ডাটা যেন আমার একেবারে হাড়ে গিয়ে বিঁধছে। এদিকে, সন্ধ্যেবেলা আমি এর থেকেও ঠাণ্ডা একটি জায়গায় ভীড়ের মধ্যে বসে থাকি।

এখন যেন একটা বরফের ছুঁচ আমার বুকের ভেতর খোঁচা মারতে থাকে। তাতে সর্বক্ষণ এক অসহায় অসাড়তা আমাকে ঘিরে রাখে। আমি শুধু মনে মনে বলি, আমার সামনে অনেক পথ খোলা। কেমন করে উড়তে হয়, তা তো আমি ভুলে যাইনি। —আবার, হঠাৎ এক সময় জু-চুনের মৃত্যুর কথা ভাবি। কিন্তু পরক্ষণেই লজ্জা পেয়ে গিয়ে নিজেকে গালাগালি দিই।

লাইব্রেরীতে যখন থাকি, প্রায়ই একটা না একটা নতুন পথ বিদ্যুৎ ঝলকের মতো আমার চোখের সামনে দেখা দিয়ে যায়। কল্পনা করি, জু-চুন সাহসের সাথে বাস্তবের মোকাবেলা করেছে,

নির্ভয়ে ঠাণ্ডা বাসাটা ছেড়ে চলে গেছে। হ্যাঁ, তা-ই। আর, তার চেয়েও বড়ো কথা, চলে গেছে সে মনে আমার প্রতি কোনো বিদ্বেষ না রেখেই। তখন আমার মনে হয়, আমি যেন এক ফালি হালকা মেঘ, শূন্যে ভেসে বেড়াচ্ছি। ওপরে নীল আকাশ। আর, নিচে উঁচু উঁচু পাহাড় আর বিশাল সমুদ্র, বিরাট বিরাট আকাশ ছোঁয়া ইমারত, যুদ্ধক্ষেত্র, মোটরগাড়ী, জনপথ, বড়ো-লোকের ঘরবাড়ী, ঝলমলে, হৈ চৈ ভরা হাটবাজার আর অন্ধকার রাত।

অপিচ, আমার মনে হতে থাকে, এই নতুন জীবনটা এক-দম হাতের কাছে এসে গেছে।

পিকিংয়ের হাড়-কাঁপানো শীতটা আমরা কোনো রকমে কাটিয়ে যাই। কিন্তু মনে হয়, আমরা যেন দুষ্টু ছেলের হাতে পড়া ফড়িং। যারা আমাদের সুতো দিয়ে বেঁধে রেখে খেলা করে আর যখন খুশি, যন্ত্রণা দেয়। বেঁচে আমরা এখনো আছি। কিন্তু মুখ থুবড়ে। এবং যে কোনো মুহূর্তে প্রাণ বেরিয়ে যেতে পারে।

'স্বাধীনতাসুহৃদ'-এর সম্পাদকের কাছে তিন-তিনখানা চিঠি লেখবার পর তবে জবাব মেলে। খামের ভেতর দুখানা টোকেন আসে। একখানা বিশ, একখানা তিরিশ সেন্টের। কিন্তু তাগাদা দিতে গিয়ে ইতিমধ্যে ডাকখরচায় আমার নয় সেন্ট বেরিয়ে গেছে। এবং আমি পুরো একটা দিন না খেয়ে কাটিয়েছি। সব বৃথা।

কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার মনে হয়, আমি যা আশা করে-ছিলাম, এবার তা পেয়ে গেছি।

শীত পেরিয়ে বসন্ত আসছে। এখন আর হাওয়াটা অতো ঠাণ্ডা লাগে না। আমি আরো বেশী করে বাইরে ঘুরে বেড়াই। সাধারণতঃ সন্ধ্যার আগে বাসায় ফিরিনে।

সেদিন চারদিকে অন্ধকার নেমে এসেছে। আমি নিস্পৃহ-ভাবে বাসায় ফিরি। যেমন এসেছি আর সব দিন। এবং আর সব দিনের মতোই আমাদের গেটটার দিকে চোখ পড়তেই মনটা ভয়ানক দমে যায়। সঙ্গে সঙ্গে আমার গতি মন্থর হয়ে আসে। শেষ পর্যন্ত অবশ্যি আমার ঘরটা তক গিয়ে পৌঁছই। কিন্তু ঘরে আলো নেই এবং আলো জ্বালবার জন্যে হাতড়ে হাতড়ে দেশলাই খুঁজতে গিয়ে মনে হয়, ঘরটা যেন বড্ডো নিঝুম এবং ফাঁকা।

আমি হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি।

এক সময় অফিসার গৃহিণী জানলা দিয়ে আমায় ডাক দেন। সংক্ষেপে জানান, আজ জু-চুনের বাবা এসেছিলেন, ওঁকে নিয়ে গেছেন।

আমি যা আশা করেছিলাম, এ তো তা নয়। আমার মনে হতে থাকে, কে যেন ঘাড়ে একটা রদ্দা মেরেছে। মুখ দিয়ে আমার আর কথা সরে না।

অবশেষে এক সময় কোনো রকমে বলি, ও চলে গেছে ?

: হ্যাঁ।

: কিছু—কিছু বলে গেছে কি ?

: না। আমাকে শুধু বলেছিলেন, আপনি ফিরলে যেন খবরটা দিই, উনি চলে গেছেন।

আমি এটা বিশ্বাস করতে পারিনে। অথচ ঘরটা এতো নিঝুম এবং ফাঁকা ! জু-চুনের খোঁজে আমি এদিক-ওদিক তাকাতে

থাকি। কোনো জায়গা বাদ রাখিনে। কিন্তু পুরোণো, রঙচটা আসবাবপত্র ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না। আর, ওগুলোও বিশৃঙ্খলভাবে ছড়িয়ে রয়েছে। ওসবের ভেতর কোনো মানুষ—বা কোনো কিছু—লুকিয়ে থাকতে পারে না।

একবার মনে হয়, সে হয়তো চিঠি-টিঠি রেখে গেছে। অন্ততঃ সংক্ষেপে দু'চারটে কথা লিখে। কিন্তু না, কিছুই নেই। আছে শুধু লবণ, শুকনো লঙ্কা, আটা আর আধখানা বাঁধাকপি। সব এক জায়গায় জড়ো করা। পাশে ডজন কয়েক তামার পয়সা। সংসারে আমাদের সম্পদ বলতে ছিলো শুধু এই সব। জু-চুন এগুলো সযত্নে আমার জন্যে গুছিয়ে রেখে গেছে। একটি কথাও উচ্চারণ না করে এই কথা বলে যে, এগুলোর সাহায্যে আমি যেন আমার অস্তিত্বটা আরো দুই-একদিন টিকিয়ে রাখি।

চারপাশের সব কিছু যেন আমার ওপর চেপে বসছে। এক ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে আমি উঠোনের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াই। জায়গাটার চারদিকেই অন্ধকার। কিন্তু বাড়ীটার মাঝ-খানের কামরাগুলোয় জানলার কাগজে বাতির ঝলমলে আলো। ওখানে ওঁরা বাচ্চা মেয়েটিকে সুড়সুড়ি দিয়ে হাসাবার চেষ্টা করছেন।

আমার মনটা একটু ঠাণ্ডা হয়ে আসে। আমি যেন এই নিদারুণ জুলুমের হাত থেকে মুক্তি লাভের একটুখানি পথের আভাস দেখতে পাই। যাতে আছে উঁচু উঁচু পাহাড়, বিশাল সমুদ্র, জনপথ, ঝলমলে আলোয় ভোজ, পরিখা, আলকাতরার মতো কালো রাত, ধারালো ছুরির আঘাত, নিঃশব্দ পদক্ষেপ, আরো কতো কি!

এবার আমার টান-টান ভাবটা কেটে যায়। আমি পথ চল-

বার খরচের কথা ভাবতে থাকি। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলি।

ঘরে ফিরে আমি চুপচাপ শুয়ে থাকি। চোখ দুটি বন্ধ করে। অনেক চেষ্টায় আমার ভবিষ্যতের একটা ছবি আঁকি। কিন্তু তার অর্ধেক না পেরুতেই ছবিটা মিলিয়ে যায়। আবছা অন্ধকারে হঠাৎ মনে হয়, আমার সামনে যেন মুদিখানা থেকে আনা এক রাশ জিনিষ পড়ে আছে। তারপর দেখি, জু-চুন ছাইয়ের মতো ফ্যাকাসে মুখে একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে রয়েছে। শিশুর মতো চোখ দুটি মেলে কাতর মিনতি জানাচ্ছে। কিন্তু নিজেকে একটু সামলে নিতেই দেখি, কোথাও কিছু নেই।

কিন্তু মনটা এখনো ভারী লাগে। এমন হঠাৎ করে সত্যি কথাটা তাকে না বললে কি চলতো না? কেন আমি আরো দু'-চারটে দিন ধৈর্য ধরে থাকিনি? এখন সে জানে, তার সম্বল বলতে আছে শুধু বাবার আবেগভরা কড়া মেজাজ। ছেলেমেয়ের সাথে ব্যবহারে যিনি পাওনাদারের মতো হৃদয়হীন। তাঁর এই ব্যবহারের সাথে তার বরাতে আর জুটবে কেবল আশপাশে দাঁড়িয়ে-থাকা লোকজনের বরফের মতো ঠাণ্ডা দৃষ্টি। এসব বাদ দিলে আছে শুধু শূন্যতা। সেই শূন্যতার ভারী বোঝা বহন করা, কড়া মেজাজ আর ঠাণ্ডা চাউনির মধ্যে জীবন কাটানো,—সে যে কী ভয়ানক ব্যাপার। এবং মৃত্যুর পর কবরে একটা ফলকও জুটবে না।

জু-চুনকে সত্যি কথাটা বলা আমার উচিত হয়নি। একদিন আমরা পরস্পরকে ভালোবেসেছি। সুতরাং মিথ্যে কথা বলে যাওয়াই আমার উচিত ছিলো। সত্যি যদি সম্পদ হয়, তাহলে তো এটা শূন্যতার ভারী বোঝা হয়ে জু-চুনের ওপর চেপে বসতে

পারবে না। অবশ্যি, মিথ্যেও ফাঁকা। তবু, মিথ্যে অন্ততঃ তার জন্যে শেষ পর্যন্ত এমন হাড়-গুঁড়ো-করে-দেওয়া বোঝা হয়ে দাঁড়াতো না।

আমি ভেবেছিলাম, জু-চুনকে যদি সত্যি কথাটা বলি, সে নিঃসঙ্কোচে বুক ফুলিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারবে। ঠিক যেমন আমরা করেছি একসঙ্গে থাকতে শুরু করবার সময়। কিন্তু এসব ভাবা আমার আদৌ ঠিক হয়নি। তখন তার ভয়ডরহীনতার মূলে ছিলো ভালোবাসা।

ভণ্ডামির গুরুভার বোঝা বয়ে বেড়াবার সাহস আমার ছিলো না। সেই জন্যেই তো আমি তার ঘাড়ে সত্যের বোঝা চাপিয়ে দিই। সে আমাকে ভালোবাসতো। তাই তো এই গুরুভার বোঝা তাকে বইতে হচ্ছে। কড়া মেজাজ আর ঠাণ্ডা চাউনি সয়ে। যার জের চলবে তার জীবনের শেষ দিন অবধি।

আমি তার মৃত্যু কামনা করেছিলাম। এখন বুঝতে পারি, আমি দুর্বল। সবল কেউ যদি আমাকে ছুঁড়ে ফেলে দিতো! আমার তো সেইটিই প্রাপ্য। সেই সবল লোকটি সত্যবাদী হোক বা ভণ্ড হোক,—তাতে কিছুই এসে যায় না। অথচ জু-চুন প্রথম থেকে শেষ অবধি চেয়েছে, আমি আরো কিছু দিন বেঁচে থাকি।

এখন আমি চিচাও স্ট্রীট থেকে চলে যেতে চাই। বাসাটা বড্ডো ফাঁকা আর নির্জন লাগে। মনে হয়, একবার যদি এখান থেকে চলে যেতে পারি, তাহলে সেটা যেন হবে আবার জু-চুনকে কাছে পাওয়া। কিংবা অন্ততঃ এই শহরেই। যেখান থেকে সে যে কোনো সময় আমার কাছে চলে আসতে পারে। যেমনটি সে

আগেও করেছে, —যখন আমি হোস্টেলে থাকতাম।

আমার চিঠিগুলোর কিন্তু কোনো জবাব আসে না। বন্ধু-বান্ধবকে লিখেছিলাম, তারা যেন আমাকে একটা চাকরি খুঁজে দেয়। তাদের কাছ থেকেও কোনো সাড়া পাইনে। এখন আর কিছু করবার নেই। সুতরাং আমাদের পরিবারের পরিচিত এক ভদ্রলোকের সাথে দেখা করতে যাই। তাঁর সঙ্গে অনেক দিন দেখা-সাক্ষাৎ নেই। ভদ্রলোক আমার চাচার ছোটোবেলার সহ-পাঠী। বিশ্ববিদ্যালয়ের বড়ো ডিগ্রীধারী। খুব মানী ব্যক্তি। পিকিংয়ে আছেন অনেক কাল। বহু লোকের সাথে জানাশোনা আছে।

আমাকে দেখে দারোয়ানের চোখে অবজ্ঞার ভাব ফুটে উঠলো। সন্দেহ নেই, আমার কাপড়চোপড় জীর্ণ বলে। আমাকে ভেতরে ঢুকতে হয় বেশ কষ্টে।

চাচার বন্ধুর এখনো আমার কথা মনে আছে। কিন্তু আমার সাথে তাঁর ব্যবহারটা হয় অতি নিরুত্তাপ। আমাদের সব কথাই তিনি জানেন।

আমি তাঁকে অনুরোধ জানাই, কোথাও যদি আমার একটা চাকরির জন্যে একটু বলে-টলে দিতেন।

তিনি ঠাণ্ডা গলায় বলেন, বুঝতেই পারছো, এখানে থাকা তোমার সম্ভব নয়। কিন্তু -যাবেই বা কোথায়? বড়ো কঠিন সমস্যা। সেই -ইয়ে, —তোমার সেই বান্ধবী, জু-চুন—তুমি জানো বোধ হয়, —মারা গেছে।

কিছুক্ষণ আমার মুখ দিয়ে কোনো কথা সরে না। তারপর কোনো রকমে বলি, আপনি ঠিক জানেন?

তিনি কৃত্রিম গলায় হেসে ওঠেন, জানি বৈকি। তাদের যে-গ্রামে বাড়ী, আমার চাকর ওয়াং শেংয়ের বাড়ীও সেই খানেই।

: কিন্তু —সে মরলো কেমন করে ?

: তা কে জানে। যা ই হোক, সে মারা গেছে।

সেদিন কি ভাবে তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাসায় ফিরেছিলাম, তা আজ আর মনে নেই। আমি জানি, তিনি মিথ্যা কথা বলবেন না।

জু-চুন গত বছরও আমার কাছে ছিলো। কিন্তু আর কোনো দিন থাকবে না। সে কড়া মেজাজ আর ঠাণ্ডা চাউনির মধ্যেও শূন্যতার বোঝা বইতে প্রস্তুত ছিলো। জীবনের শেষ দিন তক। তবু, বোঝাটা তার জন্যে হয়ে উঠেছিলো বড়ো বেশী ভারী। তার ভাগ্য যে চেয়েছে, আমাব মুখ থেকে সত্যি কথাটা শুনেই সে মারা যাক ! ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হয়ে !

হ্যাঁ, বুঝতেই পারছি, এখানে থাকা আমার আর সম্ভব নয়। কিন্তু যাবোই বা কোথায় ?

আমার চারদিকে শুধু নিঃসীম শূন্যতা। মৃত্যুর মতো অপরিসীম স্তব্ধতা। আমি যেন দেখতে পাই, ভালোবাসা না পেয়ে যারা মারা গেছে, তাদের সবারই চোখের সামনে ছিলো শুধু অন্ধকার। তারা সংগ্রাম করতে গিয়ে যে তীব্র, হতাশায় ভরা কান্নায় ভেঙে পড়েছে, তাও যেন আমার কানের ভেতর বাজতে থাকে।

আমি নতুন কিছুর জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। যার কোনো নাম নেই, যা অপ্রত্যাশিতও নয়। কিন্তু সেই মৃত্যুর মতো নিস্তব্ধতার মধ্যেই আমার দিনের পর দিন কাটতে থাকে।

এখন আমি বাইরে যাই আগের থেকে অনেক কম। সময় কাটে এই বিশাল শূন্যতার ভেতর শুয়ে বসে থেকে। এই মৃত্যুর মতো স্তব্ধতা আমার হৃৎপিণ্ডটাকে কুরে কুরে খায়। আমি তাতে কোনো আপত্তি করিনে। মাঝে মাঝে স্তব্ধতাটা নিজেই যেন ভয় পেয়ে যায়, যেন হেরে গিয়ে সরে যেতে চায়। আর, তখন আমার মনের ভেতর ঝলক দিয়ে ওঠে সেই নামহীন, অপ্রত্যাশিত নতুন আশা।

সেদিন সকালটা মেঘে ঢাকা। সূর্য হাজার চেষ্টায়ও মেঘ ঠেলে একটু উঁকি দিতে পারছে না। বাতাস পর্যন্ত ক্লান্ত হয়ে আছে। তারই মধ্যে ছোটো ছোটো পায়ের থুপথুপানি আর নাকি সুরের একটা আওয়াজে আমার চোখ দুটি খুলে যায়। ঘরের এদিক-ওদিক চেয়ে কিছুই দেখতে পাইনে। কিন্তু নীচের দিকে চোখ ফেলতেই দেখি, একটা ছোট্টো জীব ঘুরে বেড়াচ্ছে। লিকলিকে, সারা গায়ে ধুলো, জ্যান্ত যতোটা নয়, তার চেয়ে বেশী মরা—

এবার আরো তীক্ষ্ণ চোখে তাকাই। সঙ্গে সঙ্গে দমটা যেন আটকে যায়। আমি লাফ দিয়ে উঠে পড়ি। জীবটা আ'সুই। সে ফিরে এসেছে।

আমি এবার চিচাও স্ট্রীটের বাসা ছেড়ে দিই। আমার বাড়ীওয়ালা আর তাঁর চাকরানীর ঠাণ্ডা দৃষ্টির ভয়ে ঠিক নয়। প্রধানতঃ আ'সুইয়ের কারণে।

কিন্তু আমি যাবো কোথায়? এমনিতে বুঝতে পারি, আমার সামনে অনেক পথ খোলা আছে। এবং মাঝে মাঝে মনে হয়, ওই তো—দেখাই যাচ্ছে, পথগুলো আমার সামনেই ছড়িয়ে

রয়েছে। কিন্তু বুঝে উঠতে পারিনে, আমি কিভাবে চলতে শুরু করবো।

অনেক চিন্তা-ভাবনার পর ঠিক করি, হোস্টেলেই উঠবো। ওখানে ছাড়া আর কোথাও আমার থাকা সম্ভব নয়। হোস্টেলের সেই জীর্ণ কামরাটা এখনো আছে। আগের মতোই রয়ে গেছে তার সেই কাঠের খাটখানা, আধমরা কড়ই গাছটা আর উইস্টারিয়া লতাটিও। কিন্তু আগে যা আমাকে প্রেম আর জীবন দিয়েছিলো, আশা এবং সুখ দিয়েছিলো, তা আর নেই। এখন আছে শুধু শূন্যতা, অন্তঃসারহীন অস্তিত্ব। যা আমি সেই সত্যটার বিনিময়ে পেয়েছি।

আমার সামনে এখন অনেক পথ খোলা। এর কোনো একটা আমায় বেছে নিতেই হবে। কেননা, আমি এখনো বেঁচে আছি। কিন্তু আমি বুঝে উঠতে পারিনে, শুরুটা কিভাবে করবো। মাঝে মাঝে মনে হয়, পথটা যেন এক বিশাল, ধূসর সাপ, কুটিল গতিতে আমার দিকে ছুটে আসছে। আমি অপেক্ষা করি, অপেক্ষা করি। আর, দেখতে থাকি, সে এগিয়ে আসছে। কিন্তু হঠাৎ সে অন্ধকারে মিলিয়ে যায়। আমার কাছে কখনো আসে না।

এখন বসন্তের প্রথম দিক। রাতগুলো বড়ো দীর্ঘ মনে হয়। আমি ঘন্টার পর ঘন্টা অলসভাবে বসে থাকি আর সকাল বেলায় রাস্তায় দেখা একটি শবযাত্রার কথা ভাবি। মিছিলটার সামনের দিকে ছিলো কাগজের প্রতিমা আর কাগজের ঘোড়া। আর, পেছন দিকে কান্না। যা শোনাচ্ছিলো মিষ্টি সুরের গানের মতো। আমার বুঝতে কষ্ট হয় না, লোকগুলো ভারী চালাক। ব্যাপা-

রটা এতোই সহজ !

এরপর আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে জু-চুনের শবযাত্রা। শূন্যতার গুরুভার সে একা বহন করেছে, একাই সেই বোঝা নিয়ে দীর্ঘ ধূসর পথ পাড়ি দিয়েছে। কেবল কড়া মেজাজ আর ঠাণ্ডা দৃষ্টির করাল গ্রাসে পড়বার জন্যে।

যদি সত্যিই বিদেহী আত্মা বলে কিছু থাকতো ! এবং কোনো পরলোক ! তাহলে, পরলোকে যতোই ঝড়ো হাওয়া বইতে থাকুক, আমি জু-চুনকে খুঁজতে যেতাম, তাকে আমার দুঃখ-বেদনার কথা জানিয়ে ক্ষমা চাইতাম। তাকে যদি না পাই, নরকের বিষাক্ত অগ্নিশিখা আমাকে ঘিরে ধরবে এবং হিংস্রভাবে আমার দুঃখ-বেদনা গ্রাস করে নেবে।

ঘূর্ণিঝড় আর অগ্নিশিখার মধ্যেই আমি দু'হাতে জু-চুনের গলা জড়িয়ে ধরবো, তারপর তার কাছে ক্ষমা চাইবো- নয়তো তাকে সুখ দেওয়ার চেষ্টা করবো।

কিন্তু—এখনকার জীবন যে নতুন জীবনের চেয়েও ফাঁকা। এখন আছে শুধু প্রথম বসন্তের রাত। যা বড়ো দীর্ঘ। আমি আজও বেঁচে আছি। সুতরাং আমাকে নতুন করে জীবন আরম্ভ করতেই হবে। আর, সে-জীবনের প্রথম কাজ শুধু আমার দুঃখ-বেদনা আর মনস্তাপের কথা বলে যাওয়া। জু-চুনের খাতিরে যেমন, তেমনি আমার নিজের খাতিরেও।

আমার সম্বল শুধু কান্না। আমি যখন জু-চুনের জন্যে চোখের জল ফেলি, তাকে বিস্মৃতির অতল তলে ডুবিয়ে দিই, আমার কান্নাটা শোনায় মধুর সুরের গানের মতো।

আমি ভুলে যেতে চাই। বিস্মৃতির যে অতল তলে আমি

জু-চুনকে সমাহিত করেছি, তার কথা আর মনে আনতে চাইনে। আমার নিজেরই খাতিরে।

জীবনে আমাকে অবশ্যই নতুন করে যাত্রা শুরু করতে হবে। সেই সত্যটাকে আমার আহত হৃদয়ের গভীরে লুকিয়ে রাখতেও। তারপর কেবল এগিয়ে চলা। নীরবে, বিস্মৃতি আর মিথ্যাকে আমার দিশারী করে···

হায়াশি ফুমিকো

আশ্রয়

একে শীতের বিকেল। তার ওপর, প্রায় ঝড়ের বেগে হাওয়া বইছে। অফিসবাড়ীগুলির ছাদ থেকে রাস্তার এপাশটাতে খানিকটা রোদ গড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু তাকে ফ্যাকাসে আলো ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না।

তবু, এইটুকুরই লোভে, রিয়ো এদিকের ফুটপাথটা বেছে নিয়েছে। তার সঙ্গে একটা থলে। পায়ে ঝড়ের ব্যস্ততা। চোখ দুটি কৌতূহলভরে মাঝে মাঝে এদিক-ওদিক ছিটকে পড়ছে। কখনো কোনো বাড়ীর গায়ে, কখনো বা রাস্তার পাশে দাঁড়-করানো কোনো গাড়ীর ওপর। কিংবা হয়তো বোমার ঘায়ে ক্ষত-বিক্ষত মাঝ-টোকিয়োর কোনো জখমের দিকে।

কিছু দুর এগিয়ে একটা হোটেলের দিকে চোখ পড়তেই রিয়ো থমকে দাঁড়ালো। ওপাশে মরচে-ধরা লোহার একটা বিরাট গাদা। তারপর গুমটি গোছের একটা কাচের দরজাওয়ালা ঘর। তার ভেতরে ওম-ওম গোছের আগুন জ্বলছে। জ্বলন্ত লাকড়ির

হালকা ফট ফট আওয়াজটা রাস্তার ওপর থেকেও শোনা যায়। ঢিলে পায়জামা পরা, মাথায় লাল রুমাল জড়ানো লম্বা একটি লোক দাঁড়িয়ে আছে ঘরটার সামনে। তার গায়ে মুখে কিসের যেন একটা মিষ্টি ভাব ছড়ানো। রিয়ো সাহসে ভর করে লোকটিকে শুধালো, চা চাই ? চা নেবেন কিছু ?

: চা ?

: হুঁ।। -রিয়োর মুখে এবার ভীরু একটা হাসি,—শিজুয়োকা চা।

তারপর হোটেলের একটা সুড়ঙ্গ মতো পথ ধরে সে এগিয়ে গেল, ফিতে খুলে থলেটা ঘরের সামনে নামিয়ে রাখলো। এবার স্পষ্ট দেখা যায়, ঘরের ভেতর একটা লোহার চুলো জ্বলছে। ওপরে পেতলের একটি কেটলি ঝুলানো। তার নল থেকে গল গল করে বেরুচ্ছে।

চুলোটার দিকে চেয়ে রিয়ো বললো, ইয়ে—একটু ভেতরে আসতে দেবেন ? খ নিকক্ষণ চুলোর পাশে দাঁড়িয়ে গা-টা গরম করে নিতাম। একে হাড়-কাঁপানো শীত। তার ওপর, অনেকক্ষণ বাইরে ঘুরেছি।

: এসো না ! চলে এসো ভেতরে। দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে আগুনের পাশে গিয়ে দাঁড়াও।

ঘরে একটা টুল ছাড়া আর কোনো আসবাব নেই। লোকটি ভেতরে ঢুকে রিয়োকে ইঙ্গিতে টুলটায় বসতে বলে। তারপর নিজে কোনার দিকে একটা প্যাকিং বাক্সের ওপর বসে পড়ে।

রিয়ো নিজের থেকেই ভেতরে যেতে চেয়েছিলো। তবু তার মুখে একটা দ্বিধার ছায়া ফুটে ওঠে। অবশ্যি, মুহূর্তখানেকের

জন্যে। তার পরই থলেটা টান মেরে ভেতরে নিয়ে যায় সে। চুলোর পাশে বসে পড়ে হাত দুখানা আগুনের দিকে বাড়িয়ে দেয়।

রিয়োর কাপড়চোপড় ছেঁড়া, নোংরা। কিন্তু মুখখানার একটা আকর্ষণ আছে। সেই মুখ আবার আগুনের আঁচে এক মুহূর্তেই হয়ে উঠেছে ঝলমলে! লোকটি একবার রিয়োর ওপর নজর বুলিয়ে নিয়ে বললো, টুলেই যাও না। আরো আরাম করে বসতে পারবে।

সে চুপ করে রইলো।

লোকটি আবার বললো, এটা নিশ্চয়ই তোমার আসল পেশা নয়? মানে,—এই চা ফেরি করে বেড়ানো?

: না, না, এই-ই আমার পেশা। শুনেছিলাম, এলাকাটা ভালো। কিন্তু সেই ভোরবেলা থেকে ঘুরছি, এর মধ্যে বিক্রি করতে পেরেছি মাত্র এক প্যাকেট চা। এবার বাড়ী ফিরতে হবে। কিন্তু ভাবলাম, খাওয়ার হাঙ্গামাটা পথ থেকেই চুকিয়ে যাই—

: তার জন্যে ভাবনা কি? এখানে বসেই খেয়ে নিতে পারবে। আর,--লোকটির মুখে একটা হাসির রেখা ফুটে উঠলো,—চা বিক্রি হয়নি, তার জন্যেই বা দুঃখ করে লাভ কি? এসব বরাত, বুঝলে না? হয়তো কাল ভালো বিক্রি হবে।

কেটলির পনিটা ফুটে উঠেছে। নল দিয়ে হিস হিস করে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। লোকটি এবার উঠে গিয়ে কেটলিটা নামিয়ে ফেললো।

রিয়ো এই অবসরে একবার ঘরের চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিলো। পিচবোর্ডের ছাদটা ধোঁয়া লেগে লেগে কালো হয়ে

গেছে। জানলার পাশে একখানা ব্ল্যাকবোর্ড। গৃহদেবতার তাকের ওপর একটা ঘট বসানো। তাতে একটা সাকাকি গাছ।

লোকটি টেবিল থেকে হালকা গোছের একটা প্যাকেট তুলে নিয়ে খুলে ফেললো। এক টুকরো কড মাছ। একটু পরেই ভাজা মাছের গন্ধে ঘরটা ভরে উঠলো।

মাছ ভাজতে ভাজতেই লোকটি রিয়োকে ডাক দিলো, এসো, বসে পড়ো। খেয়ে নাও।

রিয়ো থলে থেকে খাবারের বাটি বার করে টুলটায় গিয়ে বসলো।

লোকটি ঝাঁঝরির ওপর মাছের টুকরোটা উলটে দিতে দিতে বললো, চা ফেরি করতে বোধ হয় তেমন ভালো লাগে না? এই চায়ে কি রকম লাভ থাকে তোমার?

ঃ একশো গ্রাম চায়ে অন্ততঃ পক্ষে পঁয়ত্রিশ ইয়েন মতো থাকা উচিত। এর কমে ঠিক লাভ হয় না। কিন্তু প্যাকেটগুলো যারা পাঠায়, তারা প্রায়ই খারাপ চা মিশিয়ে দেয়। এই চা বেচে যদি তিরিশ ইয়েনও পাই তো সে-ই আমার ভাগ্যি।

রিয়োর বাটি থেকে বেরুলো রাঁধা বার্লিতে ঢাকা দুটো ছোটো ছোটো মাছ আর সিমের আটার কয়েক টুকরো পিঠে। জিনিষ-গুলো বার করেই সে খেতে বসে।

লোকটি আবার শুধালো, তোমার বাসা কোথায়?

ঃ শিতায়া মহল্লায়। আমি অবশ্যি টোকিয়োর কোনো পাড়াই আলাদা করে চিনতে পারিনে। সবই একরকম লাগে। এখানে এসেছি মাত্র সপ্তাহ কয়েক হল। এখন আছি এক বন্ধুর বাসায়। তেমন অবস্থা যতো দিন না হয়, থাকার জায়গাটুকু সে-ই দেবে।

কড মাছটুকু ভাজা হয়ে গেছে। লোকটি তার দুটো টুকরো করে ফেলে। একখানা বারকোশ থেকে কিছু আলু আর ভাত উঠিয়ে একটা টুকরোসহ রিয়োর দিকে বাড়িয়ে দেয়। রিয়ো স্মিত মুখে মাথাটা একটুখানি নুইয়ে নীরবে ধন্যবাদ জানায়। তারপর থলে থেকে এক প্যাকেট চা বার করে। কাগজের একখানা রুমালে খানিকটা চা ঢেলে লোকটির দিকে বাড়িয়ে ধরে বলে, কেট-লিতে ছেড়ে দিন।

লোকটি মাথা ঝাঁকায়। সঙ্গে সঙ্গে মৃদু হাসির টানে তার দাঁতগুলো ঝকঝক করে উঠে, না না। বড্ডো দামী জিনিষ।

রিয়ো এবার ক্ষিপ্র হাতে ঢাকনা খুলে চা-টুকু কেটলির মধ্যে ঢেলে দেয়। লোকটি বাধা দেওয়ার সময়টুকুও পায় না। সে শুধু হেসে উঠে তাক থেকে একটি পেয়ালা আর একটা মগ নিয়ে আসে। সেগুলো একটা প্যাকিং বাক্সের ওপর সাজিয়ে রাখতে রাখতে বলে, তোমার স্বামীর কথা তো কিছু শুনলাম না। বিয়ে হয়নি বুঝি তোমার ?

: হয়েছে। কিন্তু স্বামী এখন সাইবেরিয়ায়। সেই জন্যেই তো আমার এমন ভোগান্তি।

রিয়োর মনটা সঙ্গে সঙ্গে স্বামীর চিন্তায় ডুবে গেল। আজ ছয় বছর রিয়ো তার কোনো খবর জানে না। এখন তাকে যেন মনে হয় বহু দূরের কোনো জগতের মানুষ। তার মুখখানা আর সহজে মনে পড়ে না। এক কালের অতি পরিচিত গলার স্বরটা কেমন ছিলো, তাও ঠিক মতো আন্দাজ করতে রীতিমতো বেগ পেতে হয়। সকালবেলা ঘুম ভাঙলে রিয়োর এখন বুকখানা ফাঁকা-ফাঁকা লাগে। একটা বিষণ্ণ নিঃসঙ্গতা যেন তাকে আচ্ছন্ন

করে রাখে। মাঝে মাঝে তার মনে হয়, স্বামী হয়তো উত্তর মেরুর কাছ-ঘেঁষা ওই সাইবেরিয়ার ঠাণ্ডায় অশরীরী প্রেত বনে গেছে। কিংবা পাতলা, সাদা একটি থাম। অথবা শুধু এক ঝলক বরফ-কুচি-ভরা হাওয়া। আজকাল আর কারো মুখে যুদ্ধের কথা শোনা যায় না। স্বামী এখনো বন্দী হয়ে আছে, একথা লোককে জানাতে রিয়োর তাই বলতে গেলে সঙ্কোচই লাগে।

লোকটি রিয়োর স্বামীর কথা শুনে বললো, মজার ব্যাপার তো! আমি নিজেও সাইবেরিয়ায় ছিলাম। তিন বছর। আমুর নদীর কাছে। দিন কাটতো কাঠ চেলা করে। এই গত বছর কোনো রকমে ফিরে এসেছি। যাকগে,—সবই অদৃষ্ট। তোমার স্বামীর ওই দশা। কিন্তু—তোমারই বা কম কি!

ঃ আপনিও তাহলে সাইবেরিয়ায় ছিলেন? সত্যিই? আপনাকে দেখে কিন্তু কিছু বোঝা যায় না। এখন কেমন লাগে?

লোকটি কাধ ঝাঁকালো, কিছু বুঝিনে। যা-ই হোক, দেখতেই তো পাচ্ছো, এখনো বেঁচে আছি।

খাবারের বাটিটা বন্ধ করতে করতে রিয়ো একবার সন্ধানী দৃষ্টিতে লোকটির দিকে তাকালো। কেমন যেন একটা সরল অকপট ভাব আছে তার। তাকে দেখলেই মন খুলে কথা বলতে ইচ্ছে করে। অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত লোকের সামনে পড়লে রিয়োর পক্ষে যা হয়ে ওঠে কঠিন।

লোকটি শুধালো, ছেলেপুলে আছে তোমার?

ঃ আছে। বছর ছয়েকের একটা ছেলে। তাকে এখন ইস্কুলে দেওয়া দরকার। কিন্তু টোকিয়োতে তার নাম রেজিস্ট্রি করাতে গিয়ে কত হাঙ্গামাই যে পোহাতে হল! সরকারী অফিসের লোক-

গুলো এমন ! মানুষকে কষ্ট দিতে ওস্তাদ।

মাথা থেকে রুমাল খুলে মগ-পেয়ালা মুছে নিয়ে লোকটি চা ঢাললো। ধোঁয়া ওঠা চা। নিঃশব্দে একটা চুমুক দিয়ে বললো, বেশ চা তো

: ভালো লাগছে ? এটা অবশ্যি ওদের সেরা জিনিষ নয়। পাইকারীতে এক কিলোগ্রামের দাম মাত্র দু'শো দশ ইয়েন। কিন্তু—আপনি ঠিকই বলেছেন, এটাও বেশ ভালো চা।

বাতাসের বেগ ইতিমধ্যে আরো বেড়ে উঠেছে। ছাদের ওপর শোঁ শোঁ আওয়াজ। রিয়ো একবার জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকালো। বাসা এখান থেকে অনেক দূর। এতোটা পথ হেঁটেই যেতে হবে। কিন্তু ভয় করে লাভ নেই। সে সাহসে বুক বেঁধে মনে মনে তৈরী হয়ে নিলো।

লোকটি পকেট থেকে একশো ইয়েনের দুখানা কোঁকড়ানো নোট বার করলো, তোমার চা কিছু রেখে দিই। সাড়ে সাতশো গ্রাম দাও।

রিয়ো বাধা দিলো, কি যে বলেন ! থাক, এইটুকু চায়ের আর দাম দিয়ে কাজ নেই।

: না, না, তা কি করে হয় ? ব্যবসা ব্যবসাই।—লোকটি নোট দুখানা জোর করেই রিয়োর হাতের মধ্যে গুঁজে দিলো, আচ্ছা। আবার কখনো এদিকে এলে আমার এখানে এসো। আর একটু গল্পসল্প করা যাবে।

রিয়ো ছোট্টো ঘরটার চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিতে নিতে বললো, দেখি, যদি আসতে পারি। কিন্তু—আপনি কি এখানেই থাকেন ?

: থাক বৈকি। আমাকে ও লোহার গাদাটা পাহারা দিতে হয়। মাঝে মাঝে ট্রাক আসে লোহা নিতে। তখন তাদের-ও এক-আধটু সাহায্য করি। তবে, দিনের বেশীর ভাগ সময়ই আমার এইখানেই কাটে।

তাকের নীচে একটা দরজা। লোকটি পাল্লা খুলে ধরলো। ভেতরে একটা গর্ত মতো জায়গায় তকতকে বিছানা। রিয়ো লক্ষ্য করে, দরজার পিঠে ইয়ামাদার পঞ্চাশটা ঘন্টার ছবিওয়ালা একখানা রঙীন পোস্টকার্ড সাঁটা। সে মুখ টিপে হাসলো, বাঃ; চমৎকার করে লাগিয়েছেন তো পোস্টকার্ডখানা! সত্যিই, আপনি এখানে বেশ সুখেই আছেন, না?

তারপর মনে মনে লোকটির বয়েসটা আন্দাজ করতে চাইলো রিয়ো।

সেদিন থেকে ইয়োৎসুগি এলাকায় চা বিক্রি করতে আসা রিয়োর অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেল।

এখন সে এদিকে এলেই বোমার গর্তের পাশে গুমটিটায় কিছুক্ষণ বসে যায়। ইতিমধ্যে সে জেনে নিয়েছে, লোকটির নাম সুরুইশি ইয়োশিয়ো। প্রায় প্রতিদিনই লোকটি রিয়োর বাটিতে একটা না একটা খাবার জিনিষ তুলে দেয়। অবশ্য, বেশী নয়। কখনো একটুখানি কুলের আচার, কখনো বা এক টুকরো গরুর মাংস, কি, একটা সার্ডিন মাছ। রিযোর ব্যবসা এখন আগের তুলনায় ভালো চলছে। আর, এই এলাকায় তার জনকয়েক বাঁধা খদ্দেরও জুটে গেছে।

সুরুইশির সঙ্গে পরিচয় হওয়ার সপ্তাহখানেক পর রিয়ো

একদিন ছেলে রিয়ুকিচকে সাথে নিয়ে এলো।

সুরুইশি ছেলেটার সাথে কিছুক্ষণ গল্প করে। তারপর তাকে নিয়ে বেড়াতে বেরোয়। যখন ফিরে আসে, তখন রিয়ুকিচির হাতে দেখা যায় মস্তো একখানা মিষ্টি কেক। সুরুইশি তার কদম-ছাঁটি-দেওয়া মাথায় আদর করে একটা চাপড় মারে, ছেলে তোমার বেশ খেতে পারে কিন্তু। লক্ষণটা ভালো।

রিয়োর মনে অস্পষ্ট গোছের একটা প্রশ্ন উঁকি দিয়ে যায়। তার এই নতুন বন্ধুটি কি বিয়ে করেছে ?

প্রশ্ন অবশ্যি শুধু এইটিই নয়। এর সাথে জড়িয়ে আছে আরো নানান কথা। রিয়ো নিজের মনের দিকে চেয়ে অবাক হয়ে গেল। সুরুইশির কিছুই বুঝি সে জানতে বাকী রাখবে না। কল্পনার চোখ দিয়ে তার সব রূপই যেন সে দেখে নিতে চায়। রিয়োর বয়েস এখন ঊনত্রিশ। এর আগে স্বামী ছাড়া আর কোনো পুরুষের কথা সে এতো গভীরভাবে চিন্তা করেনি। ব্যাপারটা বুঝতেই সে মনে মনে চমকে উঠলো। সুরুইশির সহজ, স্বচ্ছন্দ ভাবটা কেমন করে জানি মনটাকে টানতে থাকে। কিন্তু রিয়ো তাকে ঘুণাক্ষরেও এটা জানতে দিতে রাজী নয়।

কিছুক্ষণ পর সুরুইশি বললো, আবার যেদিন আমার ছুটি থাকে, ছেলেকে নিয়ে এসো। সবাই মিলে আসাকুসায় বেড়াতে যাবো।

রিয়ো অনুরোধটা ঠেলতে পারলো না।

কিন্তু ঠিক হল, রিয়োর সেদিন আর এখানে আসবার দরকার নেই। সুরুইশি উয়েনো স্টেশনে গিয়ে অপেক্ষা করবে, এবং রিয়ো ছেলেকে নিয়ে সোজা সেখানেই চলে যাবে।

সুরুইশি অনুসন্ধান কেন্দ্রের সামনে দাঁড়িয়ে রিয়োর জন্যে অপেক্ষা করছিলো। তার পরনে ধূসর রঙের স্যুট। অত্যন্ত পুরোণো। আর, কোট-প্যান্ট দুটোই যেন তার গায়ে একেবারে সেঁটে আছে।

অবশ্যি, রিয়োর পোশাকও এমন কিছু উঁচু দরের নয়। সে পরে এসেছে কিমোনো জাতীয় একটা নীলরঙা পোশাক। তার ওপর হালকা বাদামী রঙের কোট। সবই সস্তা দামের। তবু, ভীড়ের মধ্যে রিয়োকে দেখে সুরুইশির মনে হল, সে যেন তারুণ্যে আর মাধুর্যে ঝলমল করছে। লম্বা, মোটাসোটা গড়নের সুরুইশির পাশে তাকে দেখে লোকে হয়তো ভাববে, সে ইস্কুলে পড়া মেয়ে, ছুটির দিনে বেড়াতে বেরিয়েছে।

রিয়োর বাজার করবার থলের মধ্যে তাদের দুপুরবেলার খাবার। কিছু রুটি, গোটা কয়েক কমলালেবু আর সামুদ্রিক গাছ-গাছড়া দেওয়া চারটি ভাত।

সুরুইশি আলগোছে রিয়োর কোমরে হাত দিয়ে ভীড় বাঁচিয়ে তাকে নিয়ে এগুতে লাগলো,— বৃষ্টি না নামলে বাঁচি।

আসাকুসা স্টেশনে টিউব রেলের গাড়ী থেকে নেমে তিনজনে হাঁটতে শুরু করে। মাৎসুয়া ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের সামনে দিয়ে বেরিয়ে নিতেন শিন্দো গেট অবধি চলে যায়। পথের পাশে অসংখ্য ছোটো ছোটো দোকান। রিয়ো আসাকুসার যে রূপটা কল্পনা করে রেখেছিলো, বাস্তবের সাথে তার কোনো মিল নেই। সুরুইশি একবার ইঙ্গিতে ছোট্টো, লাল একটা মন্দির দেখায়। রিয়ো শুনে অবাক হয়ে যায়, এইটিই নাকি আসাকুসার বিখ্যাত করুণা দেবীর মন্দির! দূরে কোথায় জানি লাউডস্পীকার থেকে সানাই আর বাঁশির একটা করুণ সুর ছড়িয়ে পড়ছে। বুড়ো বুড়ো

সাকাকি গাছগুলোর পাতার ফাঁক-গলা হাওয়ার হিসহিসানির সাথে মিশে সুরটা এক অদ্ভুত পরিবেশ সৃষ্টি করেছে।

পুরোণো কাপড়ের বাজার পার হয়ে তিনজনে আসাকুসা দীঘির পাড়ে গিয়ে দাঁড়ালো। দীঘির ধারে গায়ে-গা-লাগানো এক সার খাবারের দোকান। এখানে বাতাসটা পোড়া তেলের মিষ্টি গন্ধে ভারী হয়ে আছে। সুরুইশি একটি দোকানে ঢুকে রিয়ুকিচির জন্যে হলদে রঙের একটা লাড্ডু কিনে নিয়ে আসে। রিয়ুকিচি সঙ্গে সঙ্গেই লাড্ডুটায় কামড় দিতে শুরু করে।

তারা এবার একটা সরু গলির মধ্যে ঢুকে পড়ে। গলিটার দু'পাশের দেয়ালে মার্কিন ধরনের পোস্টার সাঁটা। কোনোটা রেস্তোরাঁর বিজ্ঞাপন, কোনোটা সিনেমা বা জলসার।

রিয়ো যেদিন প্রথম সুরুইশির বাসায় গিয়েছিলো, তারপর পুরো একটা মাসও পেরোয়নি। তবু, আজ এই গলিতে হাঁটতে হাঁটতে তার মনে হতে থাকে, সুরুইশি যেন তার কত কালের চেনা! এ-মানুষের সামনে তার সঙ্কোচ করবার কিছুই নেই।

এরই মধ্যে এক সময় সুরোইশি হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললো, নাঃ, বৃষ্টিটা শেষ পর্যন্ত না নেমে ছাড়লো না, দেখছি!

রিয়ো আকাশের দিকে তাকালো। সারা আকাশ ধূসর মেঘে ছেয়ে গেছে। ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়ছে। এমন আনন্দের বেড়ানোটা তাহলে সত্যিই মাটি হল।

সুরুইশি একটা দোকানের দিকে ইশারা করে বললো, এসো, বরং এইখানটায় ঢুকে পড়ি।

দোকানের সামনে একটা লণ্ঠন ঝুলানো। আলোটা চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। চিমনির গায়ে দোকানের নাম লেখা,—আনন্দময়ী

চা ভবন। রিয়োরা ভেতরে ঢুকে একটা টেবিল ঘিরে বসে পড়ে। ছাদটা কাগজের চেরি ফুল দিয়ে সাজানো। পরিবেশটা অদ্ভুত। ঘরোয়া আবহাওয়ার নামগন্ধও নেই। কিন্তু তারা বুঝি আজ কিছুতেই দমবে না,—এখানে যা পাওয়া যায়, দু'হাতে কুড়িয়ে নেবে। বয় চায়ের অর্ডার নিয়ে চলে যায়। রিয়ো সঙ্গে সঙ্গে ভাত, রুটি আর কমলালেবুগুলো তিন ভাগ করে সাজিয়ে ফেলে।

খাওয়াদাওয়া সারতে বেশীক্ষণ লাগলো না। কিন্তু ততো-ক্ষণে বৃষ্টিটা ঝেঁপে নেমেছে। সুরুইশি বললো, এইখানেই বসি। বৃষ্টিটা একটু কমলে তোমাদের নিয়ে বাসায় ফিরে যাবো।

রিয়োর মনে একটা প্রশ্ন উঁকি দিয়ে গেল। কার বাসার কথা বলছে সুরুইশি? তার, না, রিয়োর? মফস্বল শহরের মেয়ে রিয়ো। এখানে থাকে সেই শহরেরই এক বান্ধবীর সাথে, পায়রার খোপের মতো একটা বাসায়। এমনকি, নিজের ঘর বলতেও তার কিছু নেই। সুরুইশিকে নিয়ে সে-বাসায় যাওয়ার চেয়ে এখন সুরুইশির ওখানে যাওয়াও ভালো। কিন্তু তা-ই কি সম্ভব? সুরুইশির ঘরে গেলে তিনজনে শোবার আশা করা বৃথা। বড়ো জোর হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকা যাবে। মানিব্যাগ বার করে রিয়ো টেবিলের তলায় হাত ঢুকিয়ে টাকাগুলো গুনে নিলো। সাতশো ইয়েন। হোটেলে কয়েকটি ঘণ্টা কাটিয়ে নেয়ার জন্যে যথেষ্ট।

হিসেব সেরে সুরুইশির দিকে তাকালো রিয়ো, এখন আমার আসলে কি ইচ্ছে হচ্ছে, জানো? সিনেমায় যেতে। তারপর কোনো হোটেলে ঢুকে খাওয়াদাওয়া চুকিয়ে নিজের নিজের পথ ধরা যাবে। তবে, সবই বেশ খরচের ব্যাপার।

সুরুইশি হেসে উঠলো, হ্যাঁ, তা বটে। তবু তা-ই করতে

হবে।

কাঁটা থেকে ওভারকোটটা নামিয়ে নিয়ে সে রিয়ুকিচির মাথার ওপর ছুঁড়ে দেয়। তারপর ঝমঝমে বৃষ্টির মধ্যে ছুটতে ছুটতে তিনজনে সিনেমায় গিয়ে ঢোকে।

হল-এ বসবার জায়গা নেই। ছবি দেখতে হবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। পর্দার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতেই রিয়ুকিচি এক সময় সুরুইশির গায়ে হেলান দিয়ে গভীর ঘুমিয়ে তলিয়ে যায়। ঘরের ভারী, গরম হাওয়াটা যেন প্রতি মুহূর্তেই আরো ভারী, আরো গরম হয়ে উঠছে। ছাদের ওপর বৃষ্টির ঝরঝর শব্দ।

তারা যখন সিনেমা থেকে বেরুলো, তখন সন্ধ্যা নামছে। ঝড়ো হাওয়ায় ভর করে দামাল বৃষ্টিটা কলাপাতায় ছপ ছপ আওয়াজ তুলছে। এবার একটা আশ্রয় চাই। রিয়ো আর সুরু-ইশি পথের দু'ধারে চোখ ফেলে, রিয়ুকিচিকে নিয়ে ব্যস্ত পায়ে হাঁটতে থাকে।

অবশেষে একটা ছোটো হোটেল পাওয়া যায়। জীর্ণ একটা গলি পেরিয়ে মালিক তাদের নিয়ে গিয়ে তোলে একটি কার্পেট-পাতা ঘরে।

রিয়ো ঘরে ঢুকেই ভিজে মোজা জোড়া খুলে ফেলে। রিয়ু-কিচির বোধ হয় আর তর সইছিলো না। এক কোনায় বসে পড়ে সে। এবং সঙ্গে সঙ্গেই আবার ঘুমুতে শুরু করে।

ঘরের চেয়ারগুলোয় পুরোণো গদি পাতা। সুরুইশি একটা গদি উঠিয়ে নিয়ে রিয়ুকিচির মাথার নীচে গুঁজে দিলো, ব্যস, বালিশ হয়ে গেল!

জানলার ওপরে একটা নালা। বৃষ্টির জলে ভরে গেছে। তার থেকে অবিরল ধারায় আঙিনায় জল গড়িয়ে পড়ছে। আওয়াজটা শুনলে মনে হয়, ওটা যেন বহু দূরের কোনো পাহাড়ী গ্রামের ঝরণার কলধ্বনি।

সুরুইশি একখানা রুমাল বার করে রিয়োর ভিজে চুলগুলো মুছে দিতে লাগলো।

রিয়ো এবার চোখ তুলে সুরুইশির দিকে চেয়ে থাকে। শিরায় শিরায় আজ যেন এক সুখের শিহরণ জেগে উঠেছে। বৃষ্টির তরল স্পর্শে তার দেহ থেকে নিঃসঙ্গতার সব কালিমা ধুয়ে যাচ্ছে। যে-কালিমা বছরের পর বছর স্তরে স্তরে জমে উঠেছিলো।

চুল মোছা শেষ করে রিয়ো খাবারের খোঁজে বেরিয়ে পড়ে। গলিতে পশ্চিমী পোশাক পরা এক ঝিয়ের সাথে দেখা হয়। তার হাতে একটা চায়ের ট্রে। দু'বাটি স্পাগেটির অর্ডার দিয়ে রিয়ো ফিরে আসে। একটা খালি আগুনের মালসা মাঝখানে রেখে সুরুইশিকে নিয়ে চা খেতে বসে।

কিন্তু মুখোমুখি বসে সুরুইশির যেন মন ভরে না। কিছুক্ষণ পর সে উঠে এসে রিয়োর পাশে মেঝের ওপর বসে পড়ে। এবং তারপর দেয়ালে হেলান দিয়ে বাইরের দিকে তাকায়। তার সাথে সাথে রিয়োও। বৃষ্টিভেজা আকাশটা ক্রমেই আরো কালো হয়ে উঠছে।

এক সময় সুরুইশি শুধালো, তোমার বয়েস কতো, রিয়ো? বছর পঁচিশেক বোধ হয়?

রিয়ো হেসে উঠলো, কি যে বলো! আমি তো রীতিমতো বুড়ী। আমার বয়েস এখন আটাশ।

: নাকি ? তাহলে তো তুমি আমার থেকে এক বছরের বড়ো।

রিয়ো বললো, সে কি ! তুমি আমার থেকে ছোটো ! অথচ আমি ভেবেছিলাম, তোমার বয়েস অন্ততঃ পক্ষে তিরিশ।

সুরুইশির মুখের দিকে ঋজু দৃষ্টি ফেলে রিয়ো। সে-দৃষ্টি সুরুইশির চোখে গিয়ে থামে। ঘন ভুরুর নীচে আশ্রয়-নেয়া কালো, নরম এক জোড়া চোখ। সুরুইশির মুখখানা কি একটুখানি রাঙা হয়ে উঠেছে ? সে মাথা নীচু করে মোজা খুলতে থাকে। তার মোজাও ভিজে সপসপে হয়ে আছে।

বাইরে বৃষ্টির একটানা রিমঝিম আওয়াজ।

একটু পরেই ঝি খানিকটা ঠাণ্ডা স্পাগেটি আর সূপ নিয়ে আসে। রিয়ো ছেলেকে টেনে তুলে এক প্লেট সূপ বাড়িয়ে দেয়। ছেলেটা আধো-ঘুমে আধো-জাগরণে প্লেটে চুমুক দিতে থাকে।

সুরুইশি বললো, আচ্ছা, রিয়ো, রাতটা তো আমরা তিনজনে এখানেই কাটিয়ে দিতে পারি। এই বৃষ্টির মধ্যে বাসায় যাওয়াটা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

রিয়ো বললো হ্যাঁ, সেই রকমই তো মনে হচ্ছে।

সুরুইশি উঠে বেরিয়ে যায়। ফিরে আসে এক গাদা কাঁথা নিয়ে। কাঁথাগুলো মেঝের বিছিয়ে দেয় সে। সারাটা ঘর যেন মুহূর্তে বিছানায় ছেয়ে যায়। রিয়ুকিচি এক তাল কাদা হয়ে পড়ে আছে। তার গায়ে একখানা কাঁথা জড়িয়ে দেয় রিয়ো। তারপর আলো নিভিয়ে কাপড় ছেড়ে শুয়ে পড়ে। আওয়াজে বোঝা যায় ওপাশে সুরুইশিও শুয়ে পড়েছে।

কিছুক্ষণের নীরবতা। তারপর সুরুইশি বললো, হোটেলের

লোকেরা হয়তো ভাবছে, আমরা স্বামী-স্ত্রী।

: বোধ হয়। কিন্তু ওদের ধোঁকা দেওয়াটা কি ঠিক হচ্ছে?

রিয়োর গলায় রসিকতার সুর। তবু, এখন যে সে বিবসনা হয়ে কাঁথার তলায় শুয়ে আছে, একথাটা ভেবে কেমন জানি বিব্রত বোধ করতে থাকে। এতোক্ষণে, এই প্রথম। মনে হয়, তার কি যেন একটা অপরাধ হয়ে গেছে।

সঙ্গে সঙ্গে স্বামীর কথা মনে পড়ে রিয়োর। কেন জানি স্বামী আজ বড়ো বেশী ঘনিষ্ঠ হয়ে আসে মনের কাছে। যা বহু দিন ঘটেনি। কিন্তু,—নিজেকে স্মরণ করিয়ে দিলো রিয়ো,—সে তো এখানে রাত কাটাচ্ছে কেবল বৃষ্টির জন্যে। তারপর মনটা আস্তে আস্তে আবার এলোমেলো চিন্তায় ভরে ওঠে। আর, তারই মধ্যে এক সময় চোখ দুটি ঘুমে নিথর হয়ে আসে।

ওদিক থেকে ডাক শুনে ঘুমটা যখন ভেঙে গেল, তখনও চারদিক অন্ধকারে ডুবে আছে। সুরুইশি চাপা গলায় রিয়োর নাম ধরে ডাকছে। রিয়ো চমকে উঠে বসলো।

: তোমার সাথে একটু গল্প করতে ইচ্ছে হচ্ছে, রিয়ো। ওদিকে আসতে দেবে?

: না, এদিকে আসবার দরকার নেই।

এখনও ছাদের ওপর টাপুর টুপুর বৃষ্টি পড়ছে। কিন্তু ঝড়ের দাপট থেমে গেছে। সন্ধ্যেবেলা জানলার ওপর দিয়ে ছাদ থেকে যে ধারাটা গড়িয়ে পড়ছিলো, তার আওয়াজ এখন অত্যন্ত ক্ষীণ। বৃষ্টির শব্দের মধ্যেও রিয়োর মনে হয়, সুরুইশি যেন আস্তে করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো।

একটুখানি চুপ করে থাকে রিয়ো। তারপর বলে, দেখো, সুরুইশি, আমি তোমাকে কখনও কথাটা শুধোইনি। কিন্তু — তোমার তো বউ আছে।

সুরুইশি বললো, না, এখন নেই।

: বিয়ে তো করেছিলে ?

: হ্যাঁ, করেছিলাম বটে। কিন্তু লড়াই থেকে ফিরে দেখি, বউ আর একজনের ঘরে গিয়ে উঠেছে।

: দেখে তোমার রাগ হয়নি ?

: হ্যাঁ, হয়েছিলো বৈকি। কিন্তু আমার বিশেষ কিছু করবারও তো ছিলো না। সে আমাকে ছেড়ে চলে গেছে। রাগ করলেই তো তাকে ফিরিয়ে আনা যায় না।

আবার খানিকটা নীরবতা।

এবং এবারও রিয়োই নীরবতা ভাঙলো, কিসের গল্প করতে চাও ?

সুরইশি হেসে উঠলো, না, তেমন কিছু নয়। স্পাগেটিটা খুব ভালো লাগছিলো না, তাই না ?

: হ্যাঁ। ওকে কি ভালো স্পাগেটি বলে ? অথচ এক-এক বাটির জন্যে দাম নিলো একশো ইয়েন !

সুরইশি বললো, তোমার আর কিয়ুকিচির যদি নিজস্ব একটা ঘর থাকতো, তাহলে বেশ হত, না ?

: তা আর বলতে ! আচ্ছা, তোমাদের এদিকে একটা ঘর পাওয়া যায় না ? তোমার বাসার কাছাকাছি থাকতে পারলে সত্যিই খুশী হতাম, সুরু।

: আজকাল বাসা পাওয়া বেশ শক্ত। বিশেষ করে, শহরের

মাঝ-এলাকায়। তবু খোঁজ রাখবো। তুমি কিন্তু চমৎকার মানুষ, রিয়ো।

রিয়ো হেসে ফেললো, আমি ? ক্ষেপলে নাকি ?

: চমৎকার নয় তো কি ? সত্যিই চমৎকার।

রিয়ো আবার শুয়ে পড়ে। কিন্তু হঠাৎ ইচ্ছে হতে থাকে, সুরুইশিকে একবার ছুঁয়ে দেখে, তাকে নিবিড়ভাবে কাছে টেনে নেয়। আর কথা বলতে সাহস হয় না তার। কি জানি, কথার সুরে যদি মনের ভাবটা ধরা পড়ে যায়! দমটা বুঝি আটকে আসে। সারা শরীর ঝিমঝিম করছে।

ঝড় ঝড় আওয়াজ তুলে জানলার পাশ দিয়ে একখানা ট্রাক ছুটে গেল। কাক-ভোরে ঘুম-ভাঙা প্রথম দলের।

কিছুক্ষণ পর রিয়ো শুধালো, তোমার বাবা-মা কোথায় থাকেন, সুরু ?

: দেশে। আমাদের বাড়ী কুকুওকার কাছে।

: তুমি না বলেছিলে, টোকিয়োতে তোমার এক বোন আছে ?

: হ্যাঁ। তার অবস্থাও তোমারই মতন। দুটো বাচ্চা নিয়ে থাকে। একটি সেলাই কল আছে। তাই দিয়ে পশ্চিমী ছাঁটের জামাকাপড় তৈরি করে। ওর স্বামী মারা গেছে, বছর কয়েক আগে,—চীনে লড়াই করতে গিয়ে। খালি লড়াই আর লড়াই! এ আর শেষ হল না!

রিয়ো জানলার দিকে তাকালো। ভোরের আলো ফুটে উঠেছে।

দুজনের এই এক সাথে কাটাবার রাতটার তাহলে আর কতোটুকুই বা আছে! রিয়োর মনটা খারাপ হয়ে যায়। কোনো

কারণ খুঁজে পায় না সে। তবু ভাবতে থাকে, সুরুইশি যদি এতো সহজে হাল ছেড়ে না দিতো! আবার, সেই সঙ্গেই মনে হয়, এই -ই ভালো। এর থেকে ভালো আর কি-ই বা করবার ছিলো? সুরুইশির জায়গায় যদি এমন কেউ থাকতো, যে তেমন চেনাজানা নয় কিংবা যার জন্যে রিয়োর আদৌ কোনো দরদ নেই, তাহলে রিয়ো হয়তো ভবিষ্যতের ভাবনা না ভেবে নিজেকে তার হাতে তুলে দিতে পারতো। কিন্তু সুরুইশির কথা আলাদা,—একেবারেই আলাদা।

ওপাশ থেকে আবার সুরুইশির গলা শোনা গেল, ঘুমুতে পারছিনে, রিয়ো। একদম ঘুম আসছে না। মানে, এরকম অবস্থায় কখনো পড়িনি কিনা, তাই।

: কি রকম অবস্থা?

: ইয়ে,—মেয়েছেলের সাথে এক ঘরে রাত কাটানো।

: থাক, আমাকে আর ওসব শুনিয়ে কাজ নেই। মাঝে মাঝে মেয়ে-বন্ধু তো জোটে।

: সেসব তো খালি পেশাদার মেয়ে-বন্ধু।

রিয়ো হেসে উঠলো, বেটাছেলের কিছুই বাধে না। অন্ততঃ কোনো কোনো ব্যাপারে—

কথাটা রিয়ো শেষ করতে পারলো না। সুরুইশির পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। হঠাৎ সে রিয়োর কাছে চলে এসেছে। এই যে! একেবারে গায়ের উপর ঝুঁকে পড়েছে। রিয়ো নিঃসাড় হয়ে গেল।

: রিয়ো,—রিয়ো—

রিয়ো অস্ফুট স্বরে বললো, এটা অন্যায়। আমার স্বামীর

প্রতি অবিচার—

কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তার মনে হয়, একথাটা না বলাই ছিলো ভালো। তার দেহের জবাব আলাদা। স্বামীও অনেক দূরের মানুষ, অস্পষ্ট।

দিন দুয়েক পর রিয়ো ছেলেকে নিয়ে সুরুইশির বাসার দিকে বেড়াতে বেরুলো। মনটা আনন্দে ভরা।

কিন্তু বোমার গর্তটার কাছে পৌছতেই সে অবাক হয়ে যায়। রোজই সে দেখতে পায়, সুরুইশি মাথায় লাল রুমাল বেঁধে ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। কিন্তু আজ সেখানে কেউ নেই।

তাহলে কি ভেতরে আছে সুরুইশি ? রিয়ুকিচি ছুটতে ছুটতে ঘরের দিকে চলে যায়। কিন্তু পর মুহূর্তেই ফিরে এসে জানায়, ঘরে অন্য লোক, না।

রিয়োর মনটা উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। এবার সে নিজেই দ্রুত পায়ে এগিয়ে গিয়ে ঘরের ভেতর উকি দেয়। দুজন মজুর সুরুইশির জিনিসপত্র এক কোনায় এনে জড়ো করছে। একটা লোক মুখ ফিরিয়ে শুধালো, কি ?

: সুরুইশিকে খুঁজছিলাম।

: সে কি। আপনি জানেন না ? সুরুইশি কাল মারা গেছে।

: মারা গেছে !

আরো কি যেন বলতে চায় রিয়ো। কিন্তু ভাষা খুঁজে পায় না। ঘরে উঁকি দিতেই তার চোখে পড়েছিলো, ঠাকুরের তাকের ওপর ছোট্টো একটা মোমবাতি জ্বলছে। এতোক্ষণে এর করুণ অর্থটা রিয়োর কাছে ধরা দেয়।

লোকটি তখন বলছে, হ্যাঁ, কাল রাত্তিরে আটটার দিকে মারা যায়। একখানা ট্রাক এসেছিলো। তার ড্রাইভারের সাথে ওমিয়াতে কিছু লোহার রড ডেলিভারি দিতে যায়। পথে ট্রাক-খানা একটা সরু পুলের ওপর থেকে উলটে পড়ে। সে আর ড্রাই-ভার দুজনেই মারা গেছে। সুরুইশির বোন শ্বশানের ব্যবস্থা কর-বার জন্যে আজ কোম্পানির একজন কর্মচারীর সাথে ওমিয়ায় গেছে।

রিয়ো শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। লোক দুটি তার চোখের সামনেই সুরুইশির জিনিষপত্র গুছিয়ে ফেলছে। বোধ হয় অন্য কোথাও নিয়ে যাবে। রিয়ো এসব যেন দেখেও দেখতে পাচ্ছে না। তাকের ওপর, মোমবাতিটার কাছে, দু'প্যাকেট চা। প্যাকেট দুটো সুরুইশি প্রথম দিন রিয়োর কাছ থেকে কিনেছিলো। সেটা কি মাত্র দু'সপ্তাহ আগের কথা? একটা প্যাকেটের অর্ধেকটা খালি, ওপর দিকে মুড়ে রাখা। অন্যটা এখনো খোলাই হয়নি।

ঃ আপনি বোধ হয় সুরুইশির বন্ধু? বেশ লোক ছিল সুরু। ভাবতেও কেমন লাগে,—তার তো ওমিয়ায় যাওয়ার কোনো দর-কার ছিলো না, তবু গেল। ড্রইভারটার শরীর ভালো ছিলো না। সুরু বললো, আচ্ছা, আমি যাচ্ছি তোমার সঙ্গে, দুজনে মিলে মালগুলো ওমিয়ায় নামিয়ে দিয়ে আসবো।—পাগল আর কি! যুদ্ধে কিছু হল না, সাইবেরিয়াতে না, তার পরেও কতো কাণ্ড, শেষকালে মরতে গেল কিনা অমনি করে!

একটা লোক ইয়ামাদার পোস্টকার্ড খানা খুলে নিয়ে ধুলো মুছতে থাকে। সুরুইশির যা কিছু ছিলো, সবই এখন মেঝের ওপর। একটি কেটলি, একটা ফ্রাই প্যান, এক জোড়া রবারের বুট,—

এমনি সব জিনিষ। রিয়ো চুপ করে দাঁড়িয়ে জিনিষগুলো দেখতে থাকে। ব্ল্যাকবোর্ডটার দিকে নজর পড়ে একবার। তাতে লাল খড়িমাটি দিয়ে আঁকাবাঁকা হরফে একটা খবর লেখা রয়েছে। আগে সে এটা দেখতে পায়নি,—'রিয়ো, দুটো পর্যন্ত তোমার জন্যে অপেক্ষা করেছিলাম। আজ রাত্তিরেই ফিরবো।'

লোক দুটির উদ্দেশে যন্ত্রচালিতের মতো একবার মাথা ঝুঁকিয়ে রিয়ো বিদায় নেয়। থলেটা পিঠের ওপর দুলে ওঠে। ছেলের হাত ধরে দরজার সামনে থেকে সরে আসবার সময় রিয়োর মনে হয়, সে যেন পাথর বনে গেছে। অনুভূতি বলতে তার কিছুই নেই। কিন্তু বোমার গর্তটার কাছে আসতেই তরল আগুনের ধারায় চোখ দুটি ভরে ওঠে।

: মা, লোকটা মারা গেছে ?

: হ্যাঁ, মারা গেছে।

: কেন ?

: নদীতে পড়ে গিয়েছিলো।

আগুনের ধারা দুটি এখন গাল বেয়ে নেমে আসছে। আটকে রাখবার কোনো উপায় নেই। মাঝ-টোকিয়োর পথ ধরে রিয়ো এবার দ্রুত পায়ে হাঁটতে থাকে। সামনে এখন সুমিদা নদীর ওপর খিলান-দেওয়া পুল। পুলটা পার হয়ে রিয়ো নদীর পাড় বরাবর হাকুহোর পথ ধরে।

আসাকুসার কোনো কিছুই ভোলেনি রিয়ো। তবু, সবই যেন আজ নতুন করে, চিরকালের মতো মনের পটে আঁকা হয়ে যায়। সেদিন সকালবেলা সুরুইশি বলেছিলো, পেটে যদি বাচ্চা আসে, ভেবো না, রিয়ো। তোমার যা-ই হোক না কেন, আমি তো

আছিই।—তারপর, তারা যখন বিদায় নিচ্ছে, তখন জুড়ে দিয়েছিলো, আমার টাকাপয়সা বেশী নেই। কিন্তু তোমার কিছু দরকার পড়লে আমার কাছে লুকিয়ো না। আমার মাইনে থেকে তোমাকে মাসে দু'হাজার ইয়েন করে দিতে পারবো।

কেন সে এমন কথা বলেছিলো?

আর, শুধু কি কথা? সেদিনের স্মৃতির সাথে জড়িয়ে আছে কতো ঘটনা!

সুরুইশি সেদিন খোকাকে একটা মনোহারী দোকানে নিয়ে গিয়ে বেসবল খেলার একটা টুপি কিনে দেয়। টুপিটার গায়ে রিয়ুকিচির নাম লেখা। সুরুইশি দোকান থেকে ফেরবার পর তারা তিনজনে ট্রাম লাইন ধরে হাঁটতে থাকে। পথের পাশে তখন আগের দিনের বৃষ্টির জল জমে জমে যেন এক-একটি পুকুর হয়ে আছে। তার কিনারা ঘেঁষে ঘেঁষে হাঁটতে তাদের কি ভালোই যে লাগছিলো! আসলে সেদিন তাদের মনে এমনিতেই স্ফূর্তি যেন উপচে পড়েছে।

কিন্তু সুরুইশির বোধ হয় শুধু টুপি কিনে মন ভরেনি। তাই, পথের ধারে যখন একটা দুধের দোকান দেখা যায়, সে আর চুপ করে থাকতে পারে না। রিয়ো আর রিয়ুকিচিকে নিয়ে দোকানটায় ঢুকে পড়ে। আর, সঙ্গে সঙ্গেই অর্ডার দেয়, তিনজনের জন্যেই বড়ো এক গ্লাস করে দুধ চাই। তারপর—

তারপরের কথা আর রিয়ো ভাবতে পারে না।

অন্ধকার নদীটার ওপর থেকে এখন যেন বরফের মতো ঠাণ্ডা, ঝড়ো হাওয়া আসছে। ওদিকের পাড়ে এক ঝাঁক জলচর পাখী বসে আছে। শীতে পাখীগুলো যেন জমে গেছে। চোখ-

মুখ বিষণ্ণতায় ম্লান। নদীতে মাল-বোঝাই নৌকোগুলো চলাফেরা করছে মন্থর গতিতে।

: মা, আমার একখানা খাতা লাগবে। তুমি না আজ কিনে দিতে চেয়েছিলে ?

রিয়ো বললো, পরে, বাবা, পরে কিনে দেব।

: ওই তো একটা দোকান পেছনে ফেলে এলে। ওখানে কতো খাতা রয়েছে ! কেনা যেতো না ? আমার ক্ষিধে পেয়েছে, মা। এখন কিছু খাবে না ?

: পরে, একটু পরে।

পথের পাশে এখন লম্বা এক সার ব্যারাক ধরনের বাড়ী। নিশ্চয়ই গেরস্থ মানুষের,— রিয়ো মনে মনে ধরে নিলো। এখানে যারা থাকে, হয়তো তাদের সবারই নিজের নিজের ঘর আছে। একটা জানলা থেকে একখানা তোষক ঝুলছে। হাওয়ায় মেলে দেওয়া। ভেতরে একটি মেয়েছেলে ঘরের জিনিষপত্র ঝাড়পোঁছ করছে।

রিয়ো আস্তে করে হাঁক দিলো, চা চাই ? সেরা শিজুয়োকা চা।

কোনো সাড়া পাওয়া গেল না।

রিয়ো গলাটা একটু চড়িয়ে আবার হাঁক দিলো।

এবার মহিলাটির উত্তর এলো, লাগবে না।

তোষকখানা টেনে উঠিয়ে নিয়ে সে জানলাটা সশব্দে বন্ধ করে দিলো।

রিয়ো আবার হাঁটতে থাকে। দোরে দোরে হাঁক দিয়ে একে একে সব কটি বাড়ীই পার হয়ে যায়। কিন্তু কারোই চায়ের

দরকার নেই। রিয়ুকিচি মার পায়ে পায়ে চলছে। মুখে চাপা ঘ্যানঘ্যানানি লেগেই আছে। তার নাকি ক্ষিধে পেয়েছে। পা-ও আর উঠতে চাইছে না। রিয়োর থলের ফিতেটা যেন মাংসের মধ্যে কেটে বসে গেছে। কাঁধটা ব্যথায় টনটন করছে। তবু, কেন জানি ব্যথাটা তার ভালোই লাগে। এই-ই যেন সে চায়। লাগুক ব্যথা। সারাটা শরীর ছিঁড়ে যাক।

পরদিন সে রিয়ুকিচিকে বাসায় রেখে একাই মাঝ-শহরের দিকে বেরোয়।

বোমার গর্তটার কাছে গিয়ে সে দেখে, গুমটির ভেতর আগুন জ্বলছে। আর সে নিজেকে ধরে রাখতে পারে না। এক ছুটে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। তারপর আস্তে আস্তে ভেতরেও ঢুকে পড়ে। সুরুইশির চুলোর পাশে একটি বুড়ো লোক বসে আছে। তার গায়ে খাটো ওভারকোট। যে রকম ওভারকোট মজুররা পরে। লোকটি আগুনে লাকড়ি গুঁজে দিচ্ছে। ঘরটা ধোঁয়ায় ভরে গেছে। জানলায় একটা চলন্ত কুণ্ডলী।

রিয়োর সাড়া পেয়ে বুড়োটি মুখ ঘুরিয়ে শুধালো, কি চাই ?

: আমি চা বিক্রি করি। আমার কাছে কিছু শিজুয়োকা চা আছে।

: শিজুয়োকা চা ? আমার ঘরেই তো কতো ভালো চা রয়েছে।

রিয়ো আর কিছু না বলে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে এলো।

সে ঠিক করে রেখেছিলো, সুরুইশির বোনের ঠিকানা নেবে, তারপর তার ওখানে গিয়ে সুরুইশির নামে একটা ধূপকাটি জ্বেলে

দিয়ে আসবে। কিন্তু হঠাৎ মনে হয়, এসব অর্থহীন ব্যাপার।

এবার সে নদীর দিকে চলে যায়।

নদীর ওপর শেষবিকেলের রোদ ঠিকরে পড়ছে। পাড়ের কাছে কতকগুলো ভাঙা কংক্রিটের চাঁই গাদা করা। হাত কয়েক দূরে একটা মরা বেড়ালের বাচ্চা চিত হয়ে পড়ে আছে।

রিয়ো কংক্রিটের গাদাটার ওপর বসে পড়ে সুরুইশির কথা ভাবতে থাকে। একবার মনের মধ্যে অস্পষ্ট একটা প্রশ্ন উঁকি দিয়ে যায়। সুরুইশির সাথে যদি কোনো দিন সাক্ষাৎ না ঘটতো, তাহলেই বুঝি ভালো হত। কিন্তু পরমুহূর্তেই সে আবার ভাবে না, না, অমন কথা কিছুতেই বলা চলে না। সুরুইশির সাথে পরিচয় হয়েছিলো বলে আফসোস করবার কিছু নেই। তাকে নিয়ে যা যা ঘটেছে, সেসবের জন্যেও। টোকিয়োতে আসাটাও রিয়োর অন্যায় হয়নি। সে এখানে আসে মাসখানেক আগে। তখন মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলো, ব্যবসা যদি ভালো না চলে, তাহলে দেশে ফিরে যাবে। কিন্তু এখন বুঝতে পারছে, সেটা আর সম্ভব নয়। তাকে টোকিয়োতেই থাকতে হবে। হয়তো এই মাঝ-টোকিয়োতেই। যেখানে সুরুইশি থাকতো।

আর ভাববার কিছু নেই। রিয়ো এবার উঠে দাঁড়ায়। থলেটায় একটা ঝাঁকুনি দিয়ে আবার শহরের দিকে ফিরতে থাকে।

কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করবার পর একটা ফুটপাথের ওপর থমকে দাঁড়ায় সে। সামনে একখানা কুঁড়েঘর। ঘরখানা যেন খেয়ালখুশি মাফিক পেরেক ঠুকে কতকগুলো পুরোণো বোর্ড জুড়ে তৈরি করা।

রিয়ো দরজার কাছে গিয়ে হাঁক দিলো, চা চাই? চা নেবে গো?

হাঁকটা ব্যর্থ হয় না। দরজা খুলে একটা মেয়েছেলে চৌ-

কাঠের কাছে এসে দাঁড়ায়। তার কাপড়চোপড় দেখলে মনে হয়, রিয়োও অনেক সুখে আছে।

মেয়েছেলেটি শুধায়, কতো করে ?

তারপর, রিয়োর থলেটির দিকে চোখ পড়তেই সে জুড়ে দেয়, ভেতরে এসো না। ইচ্ছে করলে একটু জিরিয়েও নিতে পারো। পয়সাকড়ি কি আছে না আছে, দেখি। কিছু চা বোধ হয় রাখতে পারবো।

রিয়ো ভেতরে ঢুকে থলেটা কাঁধ থেকে নামিয়ে ফেললো।

ঘরখানা ছোটো। মেঝেয় একটা তেলের চুলো। তার চার-পাশ ঘিরে বসে চারটি মেয়েছেলে সেলাইয়ের কাজ করছে। সামনে এক গাদা সার্ট আর মোজা। ব্যস্ত সূচগুলির ফোঁড় দেখতে দেখতে রিয়োর মনে হয়, এরা সবাই তারই মতো। সঙ্গে সঙ্গে একটা কবোষ্ণ অনুভূতিতে তার সারা দেহ নেচে ওঠে। না, তার আর কোথাও যাওয়ার দরকার নেই।

আর্থার স্লিৎস্‌লার

শ্রেষ্ঠ লগ্ন

ফ্রান্‌ৎস্‌ আর গাড়ীর ভেতর বসে থাকতে পারছিলো না, নেমে পড়ে রাস্তায় পায়চারি শুরু করলো। এরই মধ্যে চারদিকে অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। বিরল কটি আলো রাস্তার নির্জন পাশটিতে ঝোড়ো হাওয়ায় থরথর করে কাঁপছে। বৃষ্টি থেমে গেছে। ফুটপাথগুলো এখন প্রায় শুকনো। কিন্তু রাস্তা এখনো ভেজা, এখানে ওখানে জল জমে আছে।

জায়গাটা প্রাতের্‌-স্ট্রাস থেকে মাত্র ষাট হাত দূরে। এখানে দাঁড়িয়ে ভাবতে হবে, হাঙ্গেরির একটি ছোট্টো শহরে আছি! ফ্রান্‌ৎসের রীতিমতো অবাক লাগলো। কিন্তু জায়গাটা নিরাপদ। এ-রাস্তায় কোনো আলাপিতের সঙ্গে এমার সাক্ষাৎ ঘটবার সম্ভাবনা নেই।

ফ্রান্‌ৎস্‌ ঘড়ির দিকে তাকালো। মাত্র সাতটা। কিন্তু এরই মধ্যে রাত্রির অন্ধকার জমাট বেঁধে গেছে। এবার শরৎকালটা বড়ো তাড়াতাড়ি এসে পড়লো তো। আবার, বৃষ্টিই কি কম জ্বালাচ্ছে।

কলারটা তুলে দিয়ে সে আরো দ্রুত পায়ে পায়চারি শুরু করলো। রাস্তার আলোগুলির কাচে কাচে হাওয়া লেগে একটানা খুট খুট আওয়াজ উঠছে। ফ্রান্‌ৎস্‌ ভাবতে লাগলো। সে আরো আধ ঘণ্টা দেখবে। এর মধ্যেও যদি এমা না আসে, তার আর অপেক্ষা না করলেও চলবে। ঘুরতে ঘুরতে তেমাথায় পৌঁছে সে থমকে দাঁড়ালো। এখান থেকে দুটো রাস্তাই ভালো করে দেখা যায়। এবং এমা দুটোর যে কোনোটা দিয়ে আসতে পারে।

বাতাসের দমকে টুপিটা যেন উড়ে যেতে চাইছে। টুপিটা হাত দিয়ে চেপে ধরে আবার সে ভাবতে লাগলো। হ্যাঁ, আজ একা আসবে। আজ শুক্রবার, ইউনিভার্সিটিতে ফ্যাকাল্টির একটা মীটিং আছে। এমার তাই আসতে ভয় নেই। এবং থাকবেও সে অন্যান্য দিনের থেকে বেশীক্ষণ।

এতোক্ষণ ঘোড়ার গাড়ীগুলো ঠুন ঠুন আওয়াজ তুলে ঘণ্টা বাজিয়ে আসা-যাওয়া করছিলো। এবার গীর্জার ঘণ্টাও শোনা যাচ্ছে। রাস্তাটা আরো প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। লোকের ভীড় এখন আগের থেকে বেশী। ফ্রান্‌ৎসের মনে হল, সেল্‌স্‌ গার্ল আর কেরানীরাই যেন দলে ভারী। সবার পায়েই ব্যস্ততা, সবাই যেন ঝড়ের সাথে লড়াই করছে। শুধু দুটি সেল্‌স্‌ গার্ল অপলক কৌতূহলী দৃষ্টি মেলে একবার তার দিকে তাকালো। আর একটি প্রাণীও চোখ তুলে চাইছে না।

হঠাৎ ফ্রান্‌ৎসের চোখ গিয়ে পড়লো একটি পরিচিত দেহমূর্তির দিকে। মূর্তিটি তার দিকেই এগিয়ে আসছে। ফ্রান্‌ৎস্‌ও তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল। গাড়ীতে আসেনি কেন? এমাই তো?

হ্যাঁ, এমাই। ফ্রানৎস্‌কে এগিয়ে আসতে দেখে সে পায়ের

গতি কমিয়ে দিলো।

ফ্রান্‌ৎস্‌ বললো, তুমি হেঁটে এলে ?

: এই রাস্তার কাছাকাছি এসে গাড়ী ছেড়ে দিয়েছি। আমার সন্দেহ হচ্ছিলো, আগেও ওই লোকটার গাড়ীতে এখানে এসেছিলাম।

একজন পদচারী পাশ দিয়ে যেতে যেতে ত্বরিত দৃষ্টিতে একবার এমার দিকে তাকালো। তাতেই ফ্রান্‌ৎসের চোখে আর পলক পড়ে না। পারলে সে যেন লোকটিকে চোখ দিয়েই চিবিয়ে খায়। লোকটি তাড়াতাড়ি সরে গেল।

এমা দৃষ্টির রেখায় তাকে অনুসরণ করতে করতে শুধালো, কে ও ?

: জানিনে। তবে, নিশ্চিন্ত থাকতে পারো। এখানে তোমার কোনো পরিচিত লোকের সামনে পড়বার ভয় নেই। কিন্তু—আর একটু জোরে পা চালাও তো। গাড়ীতে উঠে পড়ো।

: তোমার গাড়ী ?

: হ্যাঁ !

: খোলা ?

: ঘণ্টাখানেক আগেও আবহাওয়াটা খুব ভালো ছিলো।

ফ্রান্‌ৎসের গাড়ী অপেক্ষা করছিলো, দুজনে দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেল।

গাড়ীতে উঠে ফ্রান্‌ৎস হাঁক দিলো, কোচোয়ান !

এমা বললো, সে আবার কোথায় গেল ?

ফ্রান্‌ৎস্‌ এদিক-ওদিক খুঁজছে। বললো, এ যে একেবারে অবিশ্বাস্য ব্যাপার। লোকটির টুপিটাও দেখছিনে কোথাও।

এমা এবার চাপা গলায় বললো, দোহাই তোমার।

ঃ একটু সবুর, লক্ষ্মীটি। নিশ্চয়ই এইখানেই কোথাও আছে।

কাছেই ছোট্টো একটা হোটেল। ফ্রান্‌ৎস্‌ গাড়ী থেকে নেমে গিয়ে ভেতরে উঁকি দিলো। কোচোয়ান একটা টেবিলে বসে আছে। সঙ্গে আরো কয়েকজন লোক। ফ্রান্‌ৎস্‌কে দেখেই কোচোয়ান উঠে দাঁড়ালো, এই যে,—এখানে, হুজুর।

হাতের জলো মদটুকু সে দাঁড়িয়েই দাঁড়িয়ে শেষ করলো।

ফ্রান্‌ৎস্‌ বললো, তোমার মাথায় কি পোকা ঢুকেছে? আমাদের এমন করে বসিয়ে রাখছো কেন?

ঃ মাফ করবেন, হুজুর। আমি এখনই আসছি।

কোচোয়ান একটু টলছে। সেই অবস্থাতেই সে তাড়াতাড়ি গাড়ীর কাছে ফিরে এলো, কোথায় যেতে চান, হুজুর?

ঃ প্রাতের।

বলেই ফ্রান্‌ৎস্‌ গাড়ীতে উঠে পড়লো। সঙ্গিনী এমা তখন জবুথবু হয়ে পুঁটলির মতো এক কোণে পড়ে আছে। ফ্রান্‌ৎস্‌ তার হাত দুখানা টেনে নেয়। তবু সে নিশ্চল মূর্তির মতো বসে থাকে। তাই দেখে ফ্রান্‌ৎস্‌ বললো, তুমি কি আজ আমায় কুশল প্রশ্নটাও করবে না?

ঃ দোহাই তোমার, আমায় একটুখানি চুপ করে থাকতে দাও। আমি এখনো অত্যন্ত ক্লান্ত।

ফ্রান্‌ৎস্‌ গাড়ীর দেয়ালে গা এলিয়ে দিলো।

কিছুক্ষণ কারো মুখে আর কোনো কথা নেই। গাড়ী ইতি-মধ্যে প্রাতের-স্ট্রাসে এসে পড়েছে। একটু পরেই তেগেৎহফ পার হয়ে প্রাতেরালি ধরে এগুতে লাগলো। জায়গাটা অন্ধকারে ঢাকা।

হঠাৎ এমা ফ্রান্‌ৎসকে জড়িয়ে ধরলো। এমার নেকাবটা দুজনের মাঝখানে এক স্তর ব্যবধান। ফ্রান্‌ৎস্‌ ক্ষিপ্র হাতে পর্দাটা উঠিয়ে দিয়ে এমার ঠোঁট দুটি মুখের কাছে টেনে নিলো।

এমা বললো, এতোক্ষণে তোমাকে কাছে পেলাম।

ফ্রান্‌ৎস্‌ বললো, কতো দিন পর আজ আবার দুজনের দেখা জানো?

: শেষবার দেখা হয়েছিলো রবিবারে।

: হ্যাঁ। তাও দূর থেকে।

: তার মানে? তুমি তো আমাদের বাড়ীতে গিয়েছিলে।

: হুঁ—তোমাদের বাড়ীতে। তবে, এই ভাবে চলা আর সম্ভব নয়। আমি তোমাদের বাড়ী আর যাচ্ছিনে। কিন্তু—তোমার হল কি, বলো তো?

: এই মাত্র একখানা গাড়ী গেল পাশ দিয়ে।

: আজ যারা প্রাতেরে গাড়ী নিয়ে চলাফেরা করছে, তারা তো আমাদের কোনো কিছুতে বাগড়া দিতে আসেনি, লক্ষ্মীটি!

: তা আমি মানি। কিন্তু আমাদের কোনো বন্ধু দেখে ফেলতে পারে।

: অসম্ভব। যা অন্ধকার! এর মধ্যে কেউ আমাদের চিনতে পারবে না।

: চলো না, অন্য কোথাও যাই।

: যেখানে তোমার খুশি।

: ফ্রান্‌ৎস্‌ কোচোয়ানকে ডাক দিলো।

কিন্তু তার সাড়া নেই। সে বোধ হয় ডাকটা শুনতে পায়নি।

ফ্রান্‌ৎস্‌ এবার গলা বাড়িয়ে তার পিঠে হাত রাখলো।

কোচোয়ান এতোক্ষণে মুখ ফেরায়।

: এবার অন্য দিকে যেতে হবে। ঘোড়া দুটোকে অমন করে মারছো কেন? আমাদের কোনো তাড়াহুড়ো নেই। গাড়ী ইয়ের দিকে নিয়ে যাও,—ওই যে—তোমার যে-রাস্তাটা রাইখ্‌স্‌ ব্রীজের দিকে গেছে।

: বহুৎ আচ্ছা, হুজুর।

: পাগলের মতো গাড়ী চালিয়ো না। এমন তাড়াহুড়ো করবার কোনো দরকার নেই।

: মাফ করবেন, হুজুর। আবহাওয়াটা ভালো নয় কিনা। সেই জন্যেই ঘোড়া দুটো এমন করে ছুটছে।

গাড়ী উলটো দিকে ঘুরলো।

এমা হঠাৎ শুধালো, কাল তোমায় দেখলাম না কেন?

: কেমন করে দেখবে?

: কেন? আমার তো মনে হয়, আমার বোন তোমাকেও নেমন্তন্ন করেছিলো।

: তা করেছিলো বটে।

: তাহলে তুমি গেলে না কেন?

: ভীড় ঠেলে তোমার কাছে যাবো, এটা আমার কাছে অসহ্য, —এই জন্যে।

এমা কাঁধ ঝাঁকালো। তারপর আবার তার প্রশ্ন, এটা কোন্‌ জায়গা?

গাড়ী রেলওয়ে ব্রীজের তলা দিয়ে রাইখ্‌স্‌স্ট্রাসের দিকে যাচ্ছে। ফ্রান্‌ৎস্‌ বললো, ওই রাস্তাটা দানিয়ুবের ধারে গেছে। আমরা যাচ্ছি রাইখ্‌স্‌ ব্রীজের দিকে।—তারপর স্ফূর্তির সুরে

জুড়ে দিলো, এখানে তোমার কোনো বন্ধুর সাথে দেখা হবে না।

: বড্ডো ঝাঁকুনি লাগছে।

: পথে নুড়ি দেওয়া আছে কিনা, সেই জন্যে।

: কিন্তু কোচোয়ান এতো এঁকেবেঁকে গাড়ী চালাচ্ছে কেন?

: এঁকেবেঁকে চালাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে!

ফ্রান্‌ৎস্‌ কথাটা বললো বটে, কিন্তু তার নিজেরও মনে হলো, ঝাঁকুনি যতোটা লাগা উচিত, তার চেয়ে বেশী লাগছে। কিন্তু থাক, কাজ কি এমাকে ভয় পাইয়ে দিয়ে? বললো, আজ তোমার সঙ্গে কয়েকটা জরুরী কথা আছে, এমা।

: তাহলে তোমায় এক্ষুণি শুরু করতে হচ্ছে। আমার আবার নটার মধ্যে বাড়ী না ফিরলেই নয়।

: মাত্র দুটি কথাতেই সব সেরে নেয়া যায়।

এমা হঠাৎ চীৎকার করে উঠলো, সর্বনাশ! এ কি!

গাড়ী এতোক্ষণ মোটর-রাস্তা ধরে চলছিলো। কোচোয়ান এবার রাস্তার কিনারার দিকে সরে আসবার চেষ্টা করতেই গাড়ী-খানা ছিটকে কাৎ হয়ে শূন্যে উঠে গেল। একেবারে চক্ষের পলকে। মুহূর্তখানেকের জন্যে মনে হল, প্রায় উলটেই গেছে।

ফ্রান্‌ৎস্‌ খপ করে কোচোয়ানের ক্লোকটা টেনে ধরে ধমকে উঠলো, এই! থামো! নেশায় যে একেবারে বুঁদ হয়ে আছো!

ঘোড়া দুটোকে অনেক কষ্টে থামানো গেল।

কোচোয়ান বললো, কিন্তু, হুজুর—

: এসো, এমা, আমরা এখানে নেমে পড়ি।

: এটা কোন্‌ জায়গা?

: ব্রীজের কাছে পৌঁছে গেছি। এখন আর বাতাসের ততো

জোর নেই। এসো, একটু হাঁটি। আসলে গাড়ীতে বসে কথাও বলা যায় না।

এমা মুখের পর্দাটা নামিয়ে দিয়ে হাঁটতে শুরু করলো। ফ্রান্‌ৎসের পেছনে পেছনে। পাশ দিয়ে একটু দমকা হাওয়া বয়ে যেতে দেখে তীক্ষ্ণ গলায় চীৎকার করে উঠলো, তুমি না বলছিলে, বাতাসের জোর নেই।

ফ্রান্‌ৎস্ এমার একখানা হাত টেনে নিলো, তারপর কোচোয়ানকে ডাক দিয়ে বললো, তুমিও এদিকে চলে এসো। গাড়ী শুদ্ধ।

ওরা দুজন আগে আগে হাঁটছিলো। কিছু দূর এগুতেই পুলের নীচে থেকে পানির আওয়াজ পাওয়া যায়। থাক, আর এগিয়ে দরকার নেই। চারদিকে আলকাতরার মতো অন্ধকার। প্রশান্ত নদীটার বিস্তার যেন এক সীমাহীন ধূসর প্রান্তর। দূরে কয়েকটি আলো। নদীর কোলে গা এলিয়ে লাল চোখ মেলে দোল খাচ্ছে। ফ্রান্‌ৎস আর এমা এইমাত্র নদীটা পেছনে ফেলে এলো। এপার থেকে মনে হচ্ছে, ওপারের আলোগুলি যেন জলে গলে একাকার হয়ে গেছে। কোথা থেকে জানি ক্ষীণ একটা মেঘ-গর্জনের আভাস আসছে। না, দূরে নয়, ওই তো,—কাছেই। হ্যাঁ, আরো কাছে এসে পড়েছে। এখন আর আওয়াজটা ক্ষীণ মনে হয় না।

দুজনেই চোখ তুলে তাকালো। জায়গাটা লাল আলোয় ঝলমল করছে। আলোজ্বলা জানলার সারি নিয়ে অন্ধকারের মধ্যে থেকে মুহূর্ত কয়েকের জন্যে একখানা ট্রেণ বেরিয়ে এসে আবার অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। মেঘগর্জন ক্রমে ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতরো

হয়ে যাচ্ছে। চারদিক আবার নীরব নিঝঝুম। শুধু মাঝে মাঝে ছন্দপতনের মতো শোনা যাচ্ছে ঝড়ো হাওয়ার হা-হুতাশ।

দীর্ঘ নীরবতার পর ফ্রান্‌ৎস বললো, আমাদের অন্য কোথাও চলে যাওয়া উচিত।

এমা অস্ফুট স্বরে উত্তর দিলো, তা ঠিক।

ফ্রানৎস্ উৎসাহের সুরে আবার বললো, আমাদের অন্য কোথাও চলে যাওয়া উচিত। মানে, অনেক দূরে কোথাও।

: তা সম্ভব নয়।

: তার কারণ, আমরা ভীরু। সেই জন্যেই সম্ভব নয়।

: কিন্তু আমার ছেলেটার কি হবে ?

: ছেলেকে সঙ্গে নিয়েই যেতে পারবে। তোমার স্বামী যে এতে আপত্তি করবে না, আমার কোনো সন্দেহ নেই।

এমা আস্তে আস্তে বললো, কিন্তু যাবো কেমন করে ? রাত দুপুরে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে পালিয়ে ?

: না। অমন করে কেন ? তোমায় শুধু ওকে বলতে হবে, ওর সঙ্গে থাকা তোমার পক্ষে আর সম্ভব নয়, তুমি এখন অন্যের।

: তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে, ফ্রানৎস্ ?

: তুমি যদি চাও, এ-কষ্টটুকু থেকেও তোমায় রেহাই দিই। আমি নিজেই ওকে বলবো।

: কখ্‌খনো ওকথা বলতে যেয়ো না, ফ্রানৎস।

ফ্রান্‌ৎস্ এমার মুখখানা খুঁটিয়ে দেখবার চেষ্টা করলো। কিন্তু কিছুই চোখে পড়ে না। শুধু দেখা যায়, এমা মুখ তুলে তার দিকে চেয়ে আছে। ফ্রান্‌ৎস্ এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে শান্ত গলায় উত্তর দিলো, ভয় নেই, বলবো না।

দুজনে আবার এপারের দিকে ফিরে এসেছে। এমা বললো, কিছু শুনতে পাচ্ছো ? ওটা কি ?

: ওইখান থেকেই আওয়াজটা আসছে।

ধীরে ধীরে, অন্ধকারের মধ্যে থেকে, একটি আলো এগিয়ে এলো। ছোট্টো, লাল-চোখো। একটু পরেই দেখা গেল, আলোটা এক চাষীর গাড়ীর সামনে ঝুলানো লণ্ঠনের। গাড়ীতে লোকজন আছে কিনা, বোঝা যায় না। ঠিক পেছনেই ক্যাঁচ কোঁচ আওয়াজ তুলে এগিয়ে আসছে আরো দুখানা গাড়ী। একেবারে পেছনের গাড়ীখানায় চাষীর পোশাক পরা একটি লোক বসে আছে। দেশলাই জ্বেলে পাইপ ধরাচ্ছে।

গাড়ী তিনখানা ক্রমে ক্রমে সামনে থেকে মিলিয়ে গেল।

ফ্রান্‌ৎসের গাড়ীখানা রশিখানেক আগে আগে গড়িয়ে চলেছে। তার শিথিলগতি আওয়াজটুকু ছাড়া আর কিছুই এখন কানে আসে না। পুলটার অস্পষ্ট আভাস এখন নদীর ওপারের সাথে মিশে গেছে। সামনের রাস্তাটা দু'সারি গাছের ফাঁক দিয়ে অন্ধকারের বুকে মাথা গুঁজে পড়ে আছে। ফ্রান্‌ৎসদের দু'পাশে ঘাসে-ঢাকা ঢালু পাড় গড়িয়ে গিয়ে নদীর জলে চুমুক দিচ্ছে। অন্ধকারে পাড় দুটিকে মনে হচ্ছে গভীর খাদের মতো।

অনেকক্ষণের নীরবতার পর হঠাৎ এক সময় ফ্রান্‌ৎস্‌ বলে উঠলো, তাহলে এই শেষ।

এমা বিব্রত গলায় শুধালো, কি ?

: আমাদের দেখাসাক্ষাৎ। ওর কাছেই থেকে যাও। আমি তোমার কাছ থেকে চিরদিনের মতো সরে যাবো।

: সত্যি বলছো ?

: এক বর্ণও মিথ্যে নয় !

: এখন দেখলে তো ? কতোটুকু সময়ই বা দুজনে এক সঙ্গে থাকতে পারি ! এই সময়টুকু প্রত্যেক দিন তুমিই নষ্ট করো, আমি নই।

ফ্রান্‌ৎস্‌ বললো, হ্যাঁ, হ্যাঁ, তা-ই বটে। এখন এসো, ফেরা যাক।

এমা ফ্রান্‌ৎস্‌দের হাতখানা আরো শক্ত করে চেপে ধরলো। তার গলায় মৃদু, অনুনয়ের সুর, না, এখনই নয়। আমায় তুমি এমনি করে সরিয়ে দেবে, তা আমি হতে দিচ্ছিনে।

ফ্রান্‌ৎসের মাথাটা মুখের কাছে টেনে নিয়ে এমা একটা চুমো দিলে, বরাবর এই রাস্তা ধরে চললে আমরা কোথায় গিয়ে উঠবো, বলতে পারো ?

: প্রাগ। বুঝতে পেরেছো ?

এমা একটুখানি হাসলো, না, অতো দূর আমরা যাবো না। তবে, আর একটু এগোই, চলো। অবশ্যি, তোমার যদি আপত্তি না থাকে।

ফ্রান্‌ৎস্‌ ডাক দিলো, কোচোয়ান !

কিন্তু গাড়ী থামলো না।

ফ্রান্‌ৎস্‌কে এবার গাড়ীর পিছু পিছু ছুট ধরতে হল। কোচোয়ান ঘুমিয়ে পড়েছে। গলা প্রায় সপ্তমে তুলে বেশ কয়েক-বার ডাক দেওয়ার পর তার ঘুম ভাঙলো।

: আমরা এই সোজা রাস্তাটা ধরে আরো একটু এগুবো। বুঝতে পেরেছো আমার কথা ?

: জী, হুজুর। ঠিক আছে, হুজুর।

ফ্রান্‌ৎস্‌ আর এমা গাড়ীতে উঠে বসলো।

কোচোয়ান ঘোড়া দুটিকে চাবুক মারতেই গাড়ীখানা কাদা-ভরা পথেও তীরবেগে ছুটতে শুরু করলো। ফ্রান্‌ৎস্‌ আর এমা এখনো হাতের বাঁধনে ঘনবদ্ধ। কিন্তু দুজনেই ভয়ানকভাবে দুলছে। এমার মুখখানা ক্রমে ফ্রান্‌ৎসের মুখের কাছে এগিয়ে এলো। সেই সঙ্গে অস্ফুট একটা প্রশ্নও, অপূর্ব, তাই না?

ঠিক সেই মুহূর্তেই এমার মনে হল, গাড়ীখানা যেন ছিটকে শূন্যে উঠে গেছে। এবং তাকে কে যেন বাইরে ছুঁড়ে দিচ্ছে। এমা হাত বাড়িয়ে ধরবার মতো একটা অবলম্বন খুঁজতে গেল। কিন্তু হাতের মুঠোয় হাওয়া ছাড়া আর কিছু ধরা দেয় না। এমা যেন চরকির মতো ঘুরপাক খাচ্ছে। দেহে তার তড়িতের বেগ। এখন তার চোখ দুটি বন্ধ না করলেই নয়। তারপর তার মনে হল, সে যেন মাটিতে শুয়ে রয়েছে। আর, তাকে ঘিরে আছে এক পাষাণভার নিস্তব্ধতা। সে যেন এক সীমাহীন নির্জনতায় হারিয়ে গেছে, তার উপস্থিতি পৃথিবী থেকে বহু দুরে।

একটু পরেই পাশ থেকে একটা দোমিশেলী আওয়াজ শোনা গেল। ঘোড়ার খুরের খুট খুট আকুলিবিকুলি, তার সাথে কার যেন ক্ষীণ একটা আর্তনাদ। কিন্তু এমার চোখের সামনে জমাট বেঁধে আছে শুধু অন্তহীন অন্ধকার।

হঠাৎ প্রচণ্ড এক ভয় যেন তার সারা দেহমন পিষে ফেলতে চায়। সঙ্গে সঙ্গে সে চীৎকার করে ওঠে। কিন্তু এ কি! নিজের গলাও যে সে শুনতে পাচ্ছে না! এমার ভয়টা তাতে আরো বেড়ে যায়।

কিন্তু তারপরই, অকস্মাৎ, তার মন ফিরে আসে রূঢ় বাস্তবের অনুধবানে। কিসে যেন,—হয়তো কোনো মাইলস্টোনে ধাক্কা

খেয়ে গাড়ীখানা উলটে গেছে, সে আর ফ্রান্‌ৎস গাড়ী থেকে ছিটকে পড়েছে। কিন্তু ফ্রান্‌ৎস্‌ কোথায় ?

এমা একবার ফান্‌ৎসের নাম ধরে ডাক দিলো।

এবার নিজের গলাটা শোনা গেল। খুব ক্ষীণ। তবু শোনা যায়। কিন্তু ডাকে কেউ সাড়া দিচ্ছে না। এমা উঠে বসবার চেষ্টা করলো। না, এই ক্ষমতাটুকু এখনো আছে।

উঠে বসে হাত দুখানা সামনের দিকে বাড়িয়ে দিলো এমা। কিন্তু হাত এগোয় না। একটি মানুষের দেহে বাধা পাচ্ছে। তার সামনেই। অন্ধকারটা এখন চোখে সয়ে এসেছে। আগের থেকে অনেকটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে এমা। তার সামনে পড়ে আছে ফ্রান্‌ৎস্‌। নিথর নিস্পন্দ। এমা আলগোছে ফ্রান্‌ৎসের মুখের ওপর হাত রাখলো। একটু গরম, ভিজে-ভিজে কি যেন গড়িয়ে পড়ছে। মুহূর্তে এমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল। রক্ত ! ফ্রান্‌ৎস্‌ জখম হয়ে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে আছে ! আর, কোচোয়ানটা,—সে গেল কোথায় ?

এমা কোচায়ানকে ডাক দিলো। কিন্তু কোনো সাড়া নেই।

সে আর ডাকলো না, চুপ করে বসে রইলো। তার সারা শরীর ব্যথায় টনটন করছে। কিন্তু সে বোধ হয় জখম হয়নি।

কোচোয়ানের সাড়া না পেয়ে এমা ডাক দিলো, ফ্রান্‌ৎস্‌।

এবার কাছেরই কোথা থেকে জানি সাড়া এলো, আপনি কোথায়, মিসিবাবা ? সেই ভদ্রলোক কই ? কিছু হয়নি তো ? একটু দাঁড়ান, গাড়ীর একটা আলো জ্বেলে নিই। সব ভালো করে দেখা যাবে। ঘোড়া ছুটোর আজ কি যে হয়েছে, আমার মাথায় ঢুকছে না। আমার দোষ নেই। সত্যি বলছি।

শরীরটা ব্যথায় ভেঙে পড়ছিলো। তবু এমা উঠে দাঁড়িয়েছে। কোচোয়ান জখম হয়নি দেখে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো সে। লোকটা বাতি খুলে দেশলাই জ্বালাচ্ছে। প্রচণ্ড এক ভয়ের সমুদ্রে ডুবে এমা আলোর জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলো। ফ্রান্‌ৎস, এখনো তার সামনেই পড়ে আছে। কিন্তু তাকে স্পর্শ করতেও আর সাহস হল না।

পাশ থেকে এক ফালি আলোর ঝলক এলো। এখন গাড়ী-খানা দেখা যাচ্ছে।

ওদিকে চোখ পড়তেই এমা অবাক হয়ে গেল। গাড়ী তো ঠিক উলটে যায়নি! শুধু, পাশের বড়ো নর্দমাটার কিনারায় কাৎ হয়ে পড়ে আছে। যেন কোনো চাকা খুলে গেছে। ঘোড়া দুটো একেবারে স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে আছে।

আলোটা এখন নড়াচড়া করছে। ক্রমে এমার দিকে এগিয়ে আসছে। এমা একদৃষ্টে চেয়ে থাকে। একটা মাইলস্টোন লাফিয়ে পার হয়ে, রাশখানেক পাথরের ওপর দিয়ে এগিয়ে এসে, আলোটা ফ্রান্‌ৎসের পায়ের কাছে একবার থমকে যায়। তারপর তার গা বরাবর এগুতে এগুতে মুখের ওপর দৃষ্টি ফেলে। শেষে বাতিটা কোচোয়ান ফ্রান্‌ৎসের মাথার পাশেই রেখে দেয়।

এবর হাঁটুতে ভর দিয়ে বসে ফ্রান্‌ৎসের মুখের দিকে তাকায় এমা। সঙ্গে সঙ্গে তার যেন নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়। ফ্রান্‌-সের মুখে বুঝি এক ফোঁটা রক্তও নেই। চোখ দুটি আধ-বোঁজা। তারা একেবারেই দেখা যায় না। পাতার ফাঁকে ঝকঝক করছে শুধু মণির সাদা দুটি ফালি। ডান পাশের রগ থেকে শুরু একটা রক্তের ধারা নেমে গাল বেয়ে কলারের তলায় হারিয়ে

গেছে। নীচের ঠোঁটটা দাঁতের নীচে চাপা পড়া।

এমা আপন মনেই অস্ফুট স্বরে বলে উঠলো, এ অসম্ভব!

কোচোয়ানও হাঁটুতে ভর দিয়ে বসে নিষ্পলক চোখে ফ্রান্‌ৎসে্‌র মুখের দিকে চেয়ে ছিলো। সে এবার দু'হাতে মাথাটা তুলে ধরে। কিন্তু এমার মনে হয়, ফ্রান্‌ৎসে্‌র মুখখানা যেন আপনা থেকেই উঠে আসছে। তীক্ষ্ণ একটা আর্তনাদ করে সে ফ্রান্‌ৎসে্‌র কাছ থেকে সরে গেল, ও কি করছো তুমি?

: আমার মনে হচ্ছে, সাংঘাতিক একটা কিছু ঘটে গেছে।

এমা বললো, মিথ্যে কথা! এ হতে পারে না। তোমার কিছু হয়েছে? আমার—

কোচোয়ান ফ্রান্‌ৎসে্‌র নিঃসাড় মাথাটা আস্তে করে নামিয়ে দিলো। এমার কোলের ওপর। সঙ্গে সঙ্গে এমা থরথর করে কেঁপে উঠলো!

: কোনো লোক-টোক এলে ভালো হত। মিনিট পনেরো আগে কয়েকজন চাষীকে এদিকে দেখেছিলাম। তাদের কাউকে যদি—

এমার ঠোঁট দুটিতে অস্থির কাঁপুনি, এখন আমাদের উপায়?

: ইয়ে—গাড়ীখানা ভেঙে না গেলে—কিন্তু এখন আমাদের অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছুই করবার নেই। পথ-চলতি কেউ যদি এদিকে আসে, তাহলে একটা উপায় হতে পারে।

কোচোয়ান আরো কি সব বলে যায়। কিন্তু এমা তার এক বর্ণও শুনতে পায় না। সে ভাবছিলো অন্য কথা। আস্তে আস্তে তার মনের সাহস ফিরে আসে। এখন আর ইতিকর্তব্য স্থির করতে ভুল হবে না।

এবার সে কোচোয়ানকে জিজ্ঞেস করে, এখান থেকে সবচেয়ে কাছের বাড়ীটা কতো দুর হবে ?

: বেশী দুর নয়। কাছেই ফ্রান্‌ৎস্‌ জোসেফ ল্যাণ্ড। আলো থাকলে বাড়ীগুলো দেখা যেতো। এখান থেকে মাত্র মিনিট পাঁচেকের পথ।

: ও। তাহলে তুমি যাও, একটা ব্যবস্থা করো। আমি এখানেই রইলাম।

: আচ্ছা। কিন্তু আমি আপনার কাছে থাকলেই বোধ হয় ভালো হত। এক্ষুণি পথ-চলতি কেউ নিশ্চয়ই এদিকে এসে পড়বে।

: তখন হয়তো আর কিছুই করবার সময় থাকবে না। আমাদের এখন দরকার একজন ডাক্তার।

কোচোয়ান একবার ফ্রান্‌ৎসের নিথর মুখখানার দিকে তাকালো, তারপর এমার মুখের দিকে চেয়ে মাথা ঝাঁকালো।

এমা প্রতিবাদ করলো, তা কেউ বলতে পারে না,—তুমিও না, আমিও না।

: হ্যাঁ। কিন্তু ফ্রানৎস্‌ জোসেফল্যাণ্ডে ডাক্তার কোথায় পাবো ?

: ওখান থেকে কেউ শহরে গিয়ে—

: ফ্রান্‌ৎস্‌ জোসেফল্যাণ্ডে হয়তো টেলিফোন আছে, বুঝলেন কিনা। টেলিফোনে একটা এ্যামবুলেন্স ডাকতে পারি।

: হ্যাঁ, তা-ই ভালো। দোহাই তোমার, তুমি তাড়াতাড়ি যাও। একটা কিছু ব্যবস্থা করো। এক্ষুণি চলে যাও। ও কি ! ও আবার কি হচ্ছে ?

কোচোয়ান একদৃষ্টে এমার কোলের ওপর নামানো রক্তহীন মুখখানার দিকে চেয়ে আছে। বললো, এ্যামবুলেন্স,—ডাক্তার! ওসবে আর কি হবে?

: উঃ! তুমি যাও তো এখন। দোহাই তোমার!

: আচ্ছা, যাচ্ছি। কিন্তু জায়গাটা অন্ধকার। আপনি যেন ভয় পাবেন না।

কোচোয়ান ব্যস্ত পায়ে চলে গেল।

এমা এখন একা। নিস্পন্দ দেহটি নিয়ে সে অন্ধকার রাস্তার ওপর চুপ করে বসে রইলো। না, এ কখ্খনো হতে পারে না। কথাটা এমার মাথার মধ্যে বারবার পাক খেতে থাকে। এক সময় হঠাৎ তার মনে হয়, ঠিক পাশেই কার যেন নিশ্বাস পড়ছে। এমা অমনি ঝুঁকে পড়ে ফ্রান্ৎসের ফ্যাকাসে ঠোঁট দুটির দিকে তাকায়। না, নিশ্বাসটা ফ্রান্ৎসের নয়। রগ আর গালের রক্তের রেখাটা শুকিয়ে গেছে। এমা এবার ফ্রান্ৎসের চোখ দুটির দিকে তাকায়। সঙ্গে সঙ্গে আবার সে থর থর করে কেঁপে ওঠে। এ যে মৃত্যু! তার কোলে মাথা রেখে পড়ে আছে একটি মৃতদেহ!

কথাটা ভাবতেই সে কম্পিত হাতে ফ্রান্ৎসের মাথাটা তুলে মাটিতে নামিয়ে দিলো। সে যেন এক ভয়াবহ নিঃসঙ্গতার সমুদ্রে তলিয়ে গেছে। কেন সে কোচোয়ানকে সরিয়ে দিলো? তার মাথায় যদি একটুও বুদ্ধি থাকে। এই সদর রাস্তার ওপর একটা মড়া নিয়ে সে এখন কি করে? যদি কেউ এসে পড়ে? সে তখন কি করবে?

আবার সে মৃতদেহটির দিকে তাকালো। বাতিটার আলোয় যেন তার জন্যে প্রীতি আর সহানুভূতি ঝিকমিক করছে। তার

এখন এটুকুর জন্যে কৃতজ্ঞ হওয়াই উচিত। সে একদৃষ্টে বাতিটার দিকে চেয়ে থাকে। ক্রমে তার চোখ দুটি ঝাপসা হয়ে আসে, চারপাশের সব কিছু যেন চোখের সামনে এক উন্মত্ত নাচে মেতে ওঠে।

এমা যেন এবার এক সুপ্তি থেকে জেগে ওঠে। এবং সম্বিৎ ফিরে পায়। সঙ্গে সঙ্গে সে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। লোকে দেখে ফেলুক, সে ফ্রান্‌ৎসর পাশে আছে,—এ কথ্‌খনো হতে পারে না। কিসের জন্যে সে অপেক্ষা করছে ?

দুর থেকে কয়েকটি গলার আওয়াজ ভেসে এলো। তাহলে এরই মধ্যে লোক জুটে গেছে ? এমা সন্ত্রস্ত মনে একবার কান পেতে শুনলো। আওয়াজ আসছে ব্রীজের দিক থেকে। কোচোয়ান লোক ডাকতে গেছে। কিন্তু ওরা নিশ্চয়ই তার ডাকে আসছে না। তবু, ওরা যে-ই হোক, আলোটা ওদের চোখে পড়বেই। নির্ঘাত। এমা তাও হতে দিতে পারে না। লোকগুলি যে তাহলে তাকেও দেখে ফেলবে।

এমা লাথি মেরে বাতিটা উলটে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে আলোটুকু নিভে যায়। তার চারপাশে এখন শুধু নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। ফ্রান্‌ৎস্‌কে আর দেখা যায় না। চোখে পড়ছে শুধু পাথরের সাদা স্তূপটা। তাও অস্পষ্টভাবে।

কিন্তু আওয়াজ কটি এগিয়ে আসছে। এমার সারা শরীর কেঁপে ওঠে। না, কারো সামনে পড়া চলবে না। তার কাছে এখন এটুকু ছাড়া আর কিছুরই কোনো গুরুত্ব নেই। কারো সাথে তার একটা সম্পর্ক ছিলো, এটা জানাজানি হয়ে গেলে সে দাঁড়াবে কোথায় ? লোকগুলি এগিয়ে আসছে। এখন,—এবার

তাকে থানায় যেতে হবে। তারপর আর কি? দুনিয়াময় সব জানাজানি হয়ে যাবে,—তার স্বামী, তার ছেলে, কারো কিছু জানতে বাকী থাকবে না।

এমার মনে হয়, তার পা দুখানা যেন এতোক্ষণ শেকড়ের মতো মাটির সঙ্গে আটকে ছিলো। কিন্তু তার তো আর দাঁড়িয়ে থাকার দরকার নেই। এখন সে চলে যেতে পারে। এখানে দাঁড়িয়ে থাকার অর্থ নিজের হাতে নিজের ঘরে আগুন দেওয়া। মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ফ্রান্‌ৎস্‌কে পেছনে ফেলে সে রাস্তার দিকে এগুলো, দ্রুত পায়ে রাস্তার মাঝখানটায় গিয়ে দাঁড়ালো। তার চোখের সামনে এখন এক দীর্ঘ, ধুসর সড়কের আভাস। আর, ওই যে—ওইখানে শহর। সে দেখতে পাচ্ছে না, কিন্তু পথটা আন্দাজ করতেও অসুবিধা হচ্ছে না।

আর একবার সে ঘুরে দাঁড়ালো। ঘোড়া দুটি আর গাড়ী-খানা দেখা যায়। চেষ্টা করলে—আরো একটা জিনিষের আভাস! একটি মনুষ্যদেহের অস্পষ্ট অবয়বরেখা। মানুষটি হাত-পা ছড়িয়ে মাটিতে পড়ে আছে।

এমা আবার সরে এলো। নিজের সাথে প্রাণপণে সংগ্রাম করে। পথ-ঘাট ভেজা, তার জুতোর মধ্যে পর্যন্ত কাদা ঢুকে যাচ্ছে। তবু সে পায়ের গতি বাড়িয়ে দিলো। হ্যাঁ, এই তো সে ফিরে এসেছে আলোর জগতে! তার চারপাশে এখন পরিচিত কোলাহল আর মানুষের ভীড়। রাস্তাটা যেন তার দিকে ছুটে আসছে। স্কার্টটা পায়ে জড়িয়ে তাকে বুঝি আছড়ে ফেলবে। এমা দু'হাতে স্কার্ট তুলে ধরলো। পেছন থেকে ঝড়ো বাতাস বইছে। এমাকে যেন ধাক্কা দিয়ে দিয়ে এগিয়ে নিয়ে চললো।

নিজেকে ঝড়ো হাওয়ার সামনে ছেড়ে দিতেই যেন স্মৃতির গহন থেকে একটা কথা তার চেতন মনে ভেসে উঠলো। সে পালিয়ে যাচ্ছে। কয়েকটি জীবন্ত মানুষের ভয়ে। তারা এতো-ক্ষণে নিশ্চয়ই ওখানে পৌঁছে গেছে এবং তাকে খুঁজছে। কি ভাববে লোকগুলো? যা ভাবে, ভাবুক। গাড়ীর ভদ্রলোকের সাথে একজন মহিলাও ছিলেন, তারা হয়তো শুধু এইটুকুই জানবে। আর কিছু নয়। কোচোয়ান এমাকে চেনে না এবং আবার দেখ-লেও চিনতে পারবে না। ফ্রান্‌ৎসের কাছ থেকে সরে এসে সে বড়ো ভালো কাজ করেছে। হ্যাঁ, তার চলে আসাটা একটুও অন্যায় হয়নি। কথা বলবার ক্ষমতা থাকলে ফ্রান্‌সে নিজেও এটা মানতো।

রাস্তাটার মাথার দিকে, রেলওয়ে ব্রীজের নীচে দিয়ে, শহরের আলো দেখা যাচ্ছে। এমা দ্রুত পায়ে শহরের দিকে এগুতে লাগলো। শুধু এই নির্জন রাস্তাটা পার হতে পারলে হয়। তার পরই সে নিরাপদ। দুরে একখানা গাড়ী তীক্ষ্ণ সুরে হুইস্‌ল দিচ্ছে। হুইস্‌লটা ক্রমে তীক্ষ্ণ থেকে তীক্ষ্ণতরো হয়ে উঠতে উঠতে আরো কাছে এগিয়ে এলো এবং এক সময় একখানা গাড়ী ঝড়ের বেগে তার পাশ দিয়ে চলে গেল। এমার এখন কোনো দিকেই তাকানোর ইচ্ছে নেই। তবু সে একবার থমকে দাঁড়িয়ে গাড়ীখানার দিকে চাইলো। এ্যামবুলেন্স! এটা কোথায় যাবে, এমা তা জানে। কিন্তু—এতো শীগগীর এসে গেছে? এ যে রীতিমতো অলৌকিক ব্যাপার! হঠাৎ তার বুকখানা যেন আত্ম-গ্লানির পাষাণভারে নিষ্পেষিত হয়ে গেল। এমন প্রচণ্ড আত্মগ্লানি সে জীবনে আর কোনো দিন বোধ করেনি। হ্যাঁ, সে আজ

কাপুরুষতারই পরিচয় দিয়েছে।

কিন্তু মুহূর্তেই বুকখানা তার আবার হালকা হয়ে গেল। হুইস্‌লটার রেশ দূরে মিলিয়ে যেতেই। এবং তারপর তার সারা দেহ যেন নেচে উঠলো। উদ্দাম এক আনন্দের তালে। আবার সে ঝড়ের বেগে শহরের দিকে ছুটতে লাগলো। এখন ক্রমে ক্রমে এক পুরো জনপদ তার দিকে এগিয়ে আসছে। কিন্তু মানুষকে তার আর ভয় নেই। তার চরম বিপদের মুহূর্ত পার হয়ে গেছে। শহরের কোলাহল ক্রমেই স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতরো হয়ে উঠছে, তার চোখের সামনে ভেসে উঠছে আরো বেশী আলো। প্রাতের স্ট্রাসের সারি সারি বাড়ী এরই মধ্যে দৃষ্টির সীমায় এসে গেছে। এমার মনে হয়, ওখানে যেন বিশাল এক জনতা তার জন্যে অপেক্ষা করছে। যে-জনতায় সে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে মিশিয়ে দিতে পারে। পায়ের চিহ্নটুকুও না রেখে।

রাস্তার একটা আলোর নীচে এসে দাঁড়ালো সে। মনটা এখন অনেক শান্ত। স্থির দুটি চোখ মেলে সে ঘড়ির দিকে তাকালো। নটা দশ। এখন তার মনে হচ্ছে, লোকে যেন তাকে ক্ষমা করে দিয়েছে। তার সব অপরাধ। সে যেন কোনো অপরাধ করেইনি, তার যেন কোনো দোষই নেই। সে নারী। তার ছেলে আছে, স্বামী আছে। সে কোনো অন্যায় করেনি, - যা করেছে, তা-ই ছিলো কর্তব্য। ফ্রানৎসের কাছে থেকে গেলে লোকে তাকে দেখে ফেলতো। তারপর—খবরের কাগজ। এমা তখন চিরকালের মতো সমাজে একঘরে হয়ে যেতো।

সামনে তেগেৎহফ মনুমেন্ট। ওখানে অনেকগুলি রাস্তা এসে মিলেছে। পথঘাট প্রায় নির্জন। কিন্তু সত্যিই কি তা-ই? এমার

চারপাশে যেন গোটা শহরটির প্রাণের জোয়ার বয়ে যাচ্ছে। তার হাতে অনেক সময়। স্বামীর বাড়ী ফিরতে রাত প্রায় দশটা। এমা কাপড় বদলানোর সময় পর্যন্ত পাবে। জামাকাপড়ে একবার চোখ বুলিয়ে নিলো সে। ইস, কাদায় কাদায় একেবারে একাকার হয়ে আছে। ঝি-টাকে কি বলে বোঝাবে সে?

হঠাৎ বিদ্যুৎবেগে একটা কথা তার মনের মধ্যে উঁকি দিয়ে গেল। কাল সকালের খবরের কাগজগুলো দুর্ঘটনার সব কথাই প্রকাশ করবে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। দুর্ঘটনার সময় গাড়ীতে একজন মহিলা ছিলেন, পরে তাঁকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি,—এ-খবরও কি বাদ যাবে? কথা কটি ভাবতেই আবার তার সারা শরীর শিউরে উঠলো। সব বৃথা! বড়ো অবিবেচকের কাজ করে ফেলেছে সে! ভীরু মনের আকুলি-বিকুলি তাকে মুক্তির ক্ষীণতমো আলো-টুকুও দেখায়নি।

কিন্তু না, একেবারে হতাশ হওয়ার মতো কিছু তো ঘটেনি। সদর দরজার চাবি তার কাছেই আছে। কলিং বেল টিপে ঝিকে ডাকতে হবে না,—সে ভেতরে গিয়ে ঢুকবে নিঃশব্দ পায়ে, কেউ জানতে পাবে না তার কথা। এখন শুধু দরকার তাড়াতাড়ি বাড়ী পৌঁছনো।

ব্যস্তভাবে একখানা গাড়ীতে উঠে পড়লো এমা। কোচোয়ানকে ঠিকানাটা বলা দরকার। কিন্তু না, আবার কেন ভুল করা! প্রথম যে রাস্তাটার নাম মনে এলো, তা-ই সে বলে দিলো কোচোয়ানকে। এখন তার একমাত্র কাম্য নিরাপদে বাড়ী পৌঁছনো। দুনিয়ার আর কোনো কিছুতেই তার আগ্রহ নেই। সে হৃদয়হীন নয়। কিন্তু আপন অস্তিত্বের মতোই সত্যি বলে জানে, একদিন তার মনে

সন্দেহ জাগবে। এবং এই সন্দেহই হয়তো তাকে টেনে নিয়ে যাবে সর্বনাশের অথই সমুদ্রে। কিন্তু আজ তার একমাত্র কাম্য, সে বাড়ী পৌঁছবে, অশ্রুহীন স্বাভাবিক চোখে স্বামী আর ছেলেকে নিয়ে খাবার টেবিলে গিয়ে বসবে।

গাড়ী এখন শহরের মাঝখান দিয়ে চলেছে। চৌমাথার বাঁধানো, গোল আইল্যাণ্ডটা ছাড়িয়ে পাশের একটি রাস্তায় গাড়ীখানা থামিয়ে ফেললো এমা। এবার অন্য গাড়ী। এখন আর বাড়ীর ঠিকানা বলতে বাধা নেই। কিন্তু এমার যেন কিছু ভাববার ক্ষমতাটুকুও হারিয়ে গেছে। চোখ দুটি বন্ধ করে ফেলে সে। গাড়ীখানা একবার ভয়ানক ঝাঁকুনি খেয়ে দুলে উঠে। এ কি! আবার কি গাড়ী তাকে বাইরে ছুঁড়ে ফেলবে? ভয়ে তীক্ষ্ণ আর্তনাদ করে উঠলো সে।

অবশেষে গাড়ীখানা বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়ালো। এমার আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা করবার সময় নেই। গাড়ী থেকে লাফ দিয়ে নেমে পড়ে সে সদর দরজার দিকে এগুতে লাগলো। দ্রুত, কিন্তু নিঃশব্দ পায়ে। দারোয়ানের জানলার পাশ দিয়ে যাতে কেউ তাকে দেখতে না পায়। সিড়ি পার হল ছুটতে ছুটতে, দরজা খুললো আলতো হাতে। তারপর হলঘর পেরিয়ে শোবার ঘর। এবার তার যাত্রা শেষ। আর ভয় নেই।

ঘরে ঢুকেই সে আলো জ্বাললো। এবার কাপড় বদলানো। পরনের কাপড়-জামা টান দিয়ে খুলে নিয়ে সে পাশের ছোটো কামরাটায় লুকিয়ে ফেললো। থাক এখন ওসব ওখানেই। রাত্তিরের মধ্যেই নিশ্চয়ই শুকিয়ে যাবে। কাল সে নিজের হাতে সব ময়লা মুছে ফেলবে। এখনকার কাজ শুধু হাত-মুখ ধোয়া আর

গায়ে একটি ড্রেসিং গাউন চড়ানো।

সদর দরজায় কলিং বেলের আওয়াজ। এমা পায়ের আওয়াজে বুঝলো, ঝি দরজা খুলতে যাচ্ছে। বাইরে স্বামীর গলা। তার-পর ছাতা রাখবার স্ট্যাণ্ডে তাঁর ছড়ির খটখটানি। এমাকে এবার শক্ত হতে হবে। নইলে সব ভেস্তে যাবে। তাড়াতাড়ি খাবার ঘরের দিকে এগিয়ে গেল সে। না, তালটুকু রক্ষা হয়েছে। স্বামী খাবার ঘরে এসে ঢুকলেন, ঠিক সেই মুহূর্তেই সেও ভেতরে ঢুকলো।

: তুমি এরই মধ্যে ফিরে এসেছো ?

এমা উত্তর দিলো, আর কি ? বেশ কিছুক্ষণ হল।

: ঝি তো তোমাকে আসতে দেখেনি।

এমার মুখে অনায়াসেই এক ঝলক হাসি ফুটে উঠলো। তবু হাসতে কি যে ক্লান্তি লাগে।

স্বামী এগিয়ে এসে তার কপালে একটি চুমো দিলেন।

ছেলে আগেই টেবিলে এসে বসে ছিলো। এখনো কচি ছেলে। অপেক্ষা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েছে। তার জন্যে কতোক্ষণ বসে ছিলো. কে জানে ! হাতের বইখানা থালার ওপর এসে পড়েছে, কচি মুখখানা লুটিয়ে রয়েছে খোলা বইয়ের বুকে।

এমা ছেলের পাশে বসে পড়লো।

স্বামী বসেন টেবিলের উলটো দিকে। এমার মুখোমুখি হয়ে। খবরের কাগজখানা উঠিয়ে নিয়ে একবার চোখ বুলিয়ে নেন। তার-পর কাগজ নামিয়ে রেখে বলেন, আর সবাই এখনো মীটিংয়ে রয়ে গেছেন। নানান জিনিষ নিয়ে আলোচনা করছেন।

এমা শুধালো, কি ?

তিনি মীটিংয়ের গল্প আরম্ভ করলেন।

এমাকে এবার ভান করতে হয়, সবই সে শুনছে। সে বার বার মাথা নাড়তে থাকে। কিন্তু একটি বর্ণও তার কানে ঢোকে না। উনি কিসের গল্প করছেন, কে জানে! এমার মনে পাক দিয়ে ফিরছে এখন আর এক কাহিনী। সে যেন অন্য কোনো মানুষ। যে এক আশ্চর্য কৌশলে ভয়ানক বিপদের কবল থেকে পালিয়ে এসেছে। স্বামীর গল্প চলছে, চলুক। সে চেয়ারখানা ছেলের আরো কাছে সরিয়ে এনে তার মাথাটা বুকের ওপর টেনে নিলো। সারা দেহ ছাপিয়ে যেন ক্লান্তির এক উত্তাল জোয়ার আসছে। এমা নিজেকে আর ধরে রাখতে পারছে না। চোখের সামনে ঘুমের দুর্বার হাতছানি।

সে চোখ দুটি বন্ধ করে ফেললো।

পরমুহূর্তেই একটা চিন্তা তার মনের মধ্যে ঝিলিক দিয়ে উঠলো। অকস্মাৎ। নর্দমা থেকে নিজেকে সে যখন টেনে তোলে, তখন তো নয়ই, তার পরও কথাটা তার কখনো মনে আসেনি। ফ্রান্‌ৎস্‌ যদি মারা গিয়ে না থাকে! সে যদি ডাক্তারদের বলে, আমার সঙ্গে একজন মহিলা ছিলেন, তিনিও নিশ্চয়ই গাড়ী থেকে ছিটকে পড়েছিলেন,—তাহলে কি হবে?

অধ্যাপক এমার দিকে তাকালেন। তাঁর চোখে ব্যগ্র কৌতূহল, তোমার কি হয়েছে?

: কেন,—কই, কি হয়েছে?

: হ্যাঁ,—কী হয়েছে তোমার?

এমা ছেলের মাথাটা বুকের আরো কাছে টেনে নিলো, না, কিছু হয়নি তো!

অধ্যাপক এমার দিকে চেয়ে আছেন। কিন্তু মুখে কোনো কথা নেই।

বেশ কিছুক্ষণ পর তিনি বললেন, তুমি ঝিমোতে আরম্ভ করেছিলে, তারই মধ্যে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলে।

: সত্যি ?

: হ্যাঁ। যেন তুমি কোনো খারাপ স্বপ্ন দেখেছো। সত্যিই স্বপ্ন দেখছিলে নাকি ?

: আমি কিছুই বুঝতে পারছিনে—

আয়নায় এমার ছায়া পড়েছে। ঠোঁটের কোণে এক ভয়ঙ্কর হাসির আভাস। মুখে গভীর ক্লান্তির ছাপ। এমা জানে, এ তার নিজেরই ছায়া। তবু ভয়ে তার দেহমন একেবারে চুপসে গেল। তার মুখখানা হয়ে উঠেছে পাথরের মতো নিথর। ঠোঁট নড়ানোর ক্ষমতাটুকুও নেই।

সে এবার আর্ত চীৎকারে ফেটে পড়তে চাইলো।

পরক্ষণেই তার কাঁধের ওপর নেমে এলো কার যেন দুখানা হাতের স্পর্শ।

এমা আবার আয়নার দিকে তাকালো। তার আর আয়নার মাঝখানে এগিয়ে এসেছে স্বামীর মুখখানা। শাসনে জিজ্ঞাসায় তীক্ষ্ণ তাঁর চোখ দুটি যেন তীর হয়ে তার দুই চোখে বিঁধে যাচ্ছে। এমা বুঝলো, এই তার শেষ পরীক্ষা। এটা উৎরোতে না পারলে মুক্তি নেই।

সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হল, সে যেন আবার শক্তি ফিরে পাচ্ছে। হ্যাঁ, এই তো। আবার সে নিজেকে পেয়েছে নিজের হাতের মুঠোয়। এই মহামূল্য মাহেন্দ্র মুহূর্তটি সে কিছুতেই নষ্ট করতে

পারে না। স্বামীর হাত দুখানা সে কাঁধ থেকে নামিয়ে নিলো, তাঁকে কাছে টেনে নিয়ে উজ্জ্বল অপলক প্রেমে চোখ দুটি তাঁর দিকে তুলো ধরলো।

আবার স্বামীর ঠোঁট দুটি তার কপালের ওপর নেমে এলো।

তার স্পর্শ পেতেই এমার মনের মধ্যে নীরব এক স্বগতোক্তি ঢেউ খেলে গেল,—অবশ্যই খারাপ স্বপ্ন। ফ্লান্‌ৎস্‌ নিশ্চয়ই মারা গেছে। মরা মানুষের মুখে কথা ফোটে না।

তারপর হঠাৎ তার কানে এলো, স্বামী জিজ্ঞেস করছেন, ওকথা বলছো কেন?

: কি কথা?

এমার মনে হল, সে যেন মুখর হয়ে সব কথাই বলে ফেলেছে। সামনে স্বামীর অকরুণ নিষ্পলক দৃষ্টি। সে কাটা-কাটা সুরে আবার শুধালো, কি বলছিলাম?

স্বামী আস্তে আস্তে, অত্যন্ত মৃদু গলায় তার কথাটার পুনরাবৃত্তি করলেন, মরা মানুষের মুখে কথা ফোটে না।

: হ্যাঁ—হ্যাঁ—

এমার কথা আবার কেটে যাচ্ছে কিন্তু স্বামীর দৃষ্টির অর্থ অত্যন্ত স্পষ্ট। তার কাছে সে আর কিছুই লুকোতে পারবে না।

এখন দুজনেই দুজনের দিকে চেয়ে আছে। অপলক চোখে।

অনেকক্ষণ পর এক সময় স্বামী বললেন, খোকাকে বিছানায় নিয়ে যাও, শুইয়ে দিয়ে এসো। মনে হচ্ছে, আমায় তোমার আরো কিছু বলবার আছে।

এমা উত্তর দিলো, হ্যাঁ।

সে এখন সবই বুঝতে পারছে। তাকে সকল কথাই খুলে

বলতে হবে। আর কিছুক্ষণ পরই। সামনের এই মানুষটির কাছে। যাকে সে বছরের পর বছর প্রতারিত করে এসেছে। কিন্তু আজ আর একটুও ফাঁকি দেওয়ার উপায় নেই।

ছেলেকে নিয়ে ধীর পায়ে দরজা দিয়ে বেরিয়ে যেতে যেতে এমার মনে হল, স্বামীর দৃষ্টি যেন তার পিঠের ওপর স্পর্শের মতো ছড়িয়ে আছে।

গুণসেন বিঠান

কমলির বাধা

জয়সিরি মাত্র এক সপ্তাহ আগে সেকেণ্ড লেনে একটা কামরা ভাড়া নিয়েছে।

সে সিটি প্রেসে কাজ করে। ছুটির পর সে রোজকার মতো কামরাটায় ফিরে এলো, তারপর বাইরেরকলে হাতমুখ ধুয়ে ক্যাম্প খাট বিছিয়ে জানলার পাশে শুয়ে পড়লো। জানলা দিয়ে বাইরের বেশ খানিকটা জায়গা দেখা যায়। কাছের মোড়টায়, রাস্তার পাশেই, জলের কলটা। জয়সিরি সেটাও এখান থেকে দেখতে পায়।

এপাড়ার কাউকেই সে চেনে না। পরিচয় হয়েছে শুধু বাড়ী-ওয়ালীর সাথে। যে এই কামরাটির মালিক। তার মানে, সেকেণ্ড লেন জয়সিরির কাছে এখনো অপরিচিত। বেশী টাকা দেওয়ার ক্ষমতা যদি তার থাকতো, সেকেণ্ড লেনে সে কখনো ঘর ভাড়া নিতো না। এখানকার সার-বাঁধা বাড়ীগুলির গা ছুঁয়ে সকাল-সন্ধ্যেয় লাকড়ির ধোঁয়ার একটা বিটকেলে গন্ধ ঘুরে বেড়ায়। এটা লোকে সহ্য করে কি ভাবে? জয়সিরির একটু ভয়ও লাগে।

কলের পাশের জলভরা গর্তটায় পা দিলে তার নির্ঘাত গোদ হয়ে যাবে।

কাছেই একটা বালতির ঠং ঠং আওয়াজ শোনা গেল।

কালও এমনি আওয়াজ শোনা গেছে। এটা যদি সেই বালতির আওয়াজ হয়, তাহলে এর পর একটা মনোরম কিছু দেখা যাবে।

জয়সিরির অনুমানটা মিথ্যে নয়। একটু পরই একটি তরুণীকে দেখা গেল। আজ নিয়ে দ্বিতীয় বার। ভারী মন-কেড়ে-নেয়া চেহারা মেয়েটির। পরনে লাল শাড়ী। জয়সিরির কামরার পাশ দিয়ে সে কলতলায় চলেছে।

কিছুক্ষণ পরই আবার দেখা যায়, মেয়েটি বালতি ভরে নিয়ে ফিরে আসছে। জয়সিরি এবার জানলার একেবারে কাছ ঘেঁষে বসে একদৃষ্টে তার দিকে চেয়ে রইলো। কিন্তু মেয়েটির যেন কোনো দিকেই খেয়াল নেই। সে সোজা নিজের বাসার দিকে চলে গেল।

কে এই তরুণী মেয়েটি? তার নাকটা লম্বা। গাল দুটি নিটোল। বুকখানা সুডোল। দেহে যেন যৌবনের ঢল নেমেছে। জয়সিরির বুকের ভেতর তার সব কিছুই যেন ঝলমলে একখানা ছবির মতো আঁকা হয়ে যায়। সে আপন মনে মেয়েটির কথা ভাবতে থাকে। কাল রবিবার। দিনের বেলায় গলিটার ভেতর একটু ঘুরে আসবে সে। মেয়েটি কোথায় থাকে, দেখা দরকার। নিশ্চয়ই কুমারী, চটপটে মেয়ে।

এমন ভাবনা এখন তার নিত্যকার।

কলের কাছে যেসব লোকজন আসে, তাদের কথাবার্তা শুনলে কানে আঙুল দিতে হয়। মনে সন্দেহ জাগে, অল্পবয়েসী মেয়েগুলিরও বুঝি শালীনতাবোধ নেই। কলতলার মানুষগুলি ঘটি-বালতি ভরতে এসে এমন ধস্তাধস্তি করে! আর, এতো নোংরা ভাষায় এ ওকে গালাগালি দেয়! ওই মেয়েটিও নিশ্চয়ই এসবের সামনে পড়ে। জয়সিরির মনে হয়, কাঁচা বয়েসের যে সমস্ত ছেলেমেয়ে গলিঘুঁজিতে বাস করে, তাদের যৌন কামনা প্রবল। হয়তো ওই মেয়েটিও তাদেরই মতো। তবু,-জয়সিরি শেষ পর্যন্ত একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছয়,—তার একটা মন-কেড়ে-নেয়া সৌন্দর্য আছে। যা গলিটার আর কোনো মেয়ের নেই। না, মেয়েটির সাথে আলাপ করতে হবে। যেভাবে পারা যায়। সে তো দু'বেলা কলে জল নিতে আসে।

জয়সিরির ঘরে সামনে এলেই মেয়েটির বালতির ঠং ঠং আওয়াজ শোনা যায়। এটা ইচ্ছাকৃত ব্যাপার কিনা, সে জোর করে বলতে পারবে না। মেয়েটি কলের কাছে গিয়ে কাপড় কাচতে বসে। জয়সিরিরি তখন মনে হয়, এর পর সে হয়তো কাপড়চোপড় খুলে ফেলে নাইতে শুরু করবে। কিন্তু না, শুধু কাচাকাচি সেরেই সে ফিরে আসে।

জয়সিরি এবার জানলার কাছে এগিয়ে যায়। ইচ্ছে, মেয়েটির সাথে একটু ঠাট্টা-রসিকতা করবে। কিন্তু সে কাছাকাছি আসতেই জয়সিরির পা দুখানা হিম হয়ে যায়। অনেক মেয়েই তো এজাতীয় ঠাট্টা-রসিকতা পছন্দ করে না। এও যদি তাদের মতো হয়? তাহলে তো ব্যাপারটা খুব সুবিধার দাঁড়াবে না। এমনও হতে পারে যে, সে যেন কিছুই শুনতে পায়নি, এমনি ভান করে চলে

যাবে, তারপর তার প্রণয়ীকে সব বলে দেবে।

মেয়েটির প্রণয়ীর চেহারাটা কেমন? জয়সিরি একটা কল্পনা করে। গায়ে হাতা-কাটা খসখসে বেনিয়ান, পরনে সারং, গলায় চেক রুমাল। এই পোশাকে তাকে যা অসভ্য আর হিংস্র দেখায়! জয়সিরিকে সে হয়তো বলে বসবে, দেখেন মিস্টার, এখানে রসিকতা-টতা করতে আসবেন না, বুঝলেন? নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল না মেরে ঘরের চরকায় তেল দিন গিয়ে। শেষে আবার যেন না শুনি যে, আপনাকে আগে কেন কিছু বলিনি।—ছোকরার কথায় নিশ্চয়ই জয়সিরির কামরার কাছে নানান বয়েসের মেয়ে-পুরুষের ভীড় জমে যাবে। আর, সেই ভীড় দেখে জয়সিরির ইচ্ছে হবে, আত্মহত্যা করে। সে যা মানুষ!

কিন্তু এমন পরিস্থিতিতে সে পড়তে পারে তো শুধু মেয়েটির সাথে আলাপ পরিচয় করলে আর কথা বললে। আপাততঃ ঘরের ভেতর থেকে জানলা দিয়ে তার দিকে তাকাতে কোনো বাধা নেই। জয়সিরি ক্যাম্প খাটে শুয়ে শুয়ে খবরের কাগজ পড়বে আর বালতির ঠং ঠং আওয়াজের জন্যে কান পেতে থাকবে।

আরো একটি জিনিষ জয়সিরির মনটাকে অস্থির করে রাখে। মেয়েটি কোথায় থাকে, জানতে হবে। সে তাই মাঝে মাঝে গলিটায় ঘুরে বেড়ায়। একেবারে এমাথা থেকে ওমাথা অবধি।

কিন্তু দিন কয়েক পর সে দেখে, একটি মেয়েছেলে তাকে ইশারায় ডাকছে। এই ইশারার অর্থ জয়সিরি জানে। তার মনে পড়ে, গ্রামে থাকতে সে নাগেদার হিন্নী মাহাত্যায়ার কাছে এমনি একটা কথা শুনেছে। হিন্নী মাহাত্যায়া তাকে কলম্বোর বেশ্যাদের কাহিনী বলেছিলো। তারা বস্তিতে থাকে আর ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর

রোগ ছড়ায়। জয়সিরিকে সে আরো জানায়, ওই বেশ্যাদের পেছনে যারা ঘুরে বেড়ায়, তাদের জীবন অর্থহীন হয়ে যায়। একটি লোক অসুখ বাধিয়ে হাসপাতালে ঢোকে। তার সে কী যন্ত্রণা!—এসব কথা শুনে জয়সিরি রীতিমতো ভয় পেয়ে গিয়েছিলো। এই যে মেয়েলোকটি তাকে ডাকছে, এও নিশ্চয়ই বেশ্যা। জয়সিরি তাই বেড়ানো ছেড়ে তাড়াতাড়ি তার কামরায় চলে আসে। একবার পেছন ফিরে তাকায়ও না। সে যে একেবারে দৌড়চ্ছিলো, সেটা টের পায় শুধু তখন, যখন ক্যাম্প খাটে শুয়ে হাঁপাতে থাকে।

জয়সিরির মনে এবার নতুন ভাবনা ঢোকে। সে যার বাসা খুঁজে বেড়াচ্ছিলো, সে-মেয়েও যদি এমনি হয়? অবশ্যি, তার হাবভাব দেখলে তেমন সন্দেহ করা যায় না।

হঠাৎ একটা বিশেষ ছুটি পাওয়া গেছে। জয়সিরি ঠিক করলো, একবার জাদুঘর থেকে ঘুরে আসবে।

মোরগ ডাকবার সাথে সাথেই সে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লো। তার পরই কলতলার দিকে ছুট। আর কিছু নয়, শুধু পা দুখানা ধুয়ে নিলো। পায়খানায় এরই মধ্যে লোক ঢুকে পড়েছে।

দিনের আলো ফুটতেই সে বেরেল্লার দিকে হাঁটতে শুরু করলো।

কিন্তু জাদুঘর খোলে নটার পর। জয়সিরি একবার ভাবলো, বাসায় ফিরে যায়। ঘণ্টাখানেক পরে গেলেই হবে। তারপর সে বানাথামুল্লা বাস স্টপে গিয়ে দাঁড়ালো।

বাস স্টপে যেতেই সে দেখে, রাস্তার ওপাশের একখানা বাস

থেকে সেই মেয়েটি নামছে। জয়সিরি এবার দোটানায় পড়ে গেল। এখন সে কি করবে?

মেয়েটির হাতে একটা ছোট্টো ব্যাগ। পরনে ফুলদার শাড়ী। বাস থেকে নেমেই সে ছাতা খুললো। এখন আর তার মাথা বা মুখ দেখা যায় না। সে চক্ষু হাসপাতালের মোড়টার দিকে এগুচ্ছে।

রাস্তায় প্রচণ্ড ভীড়। হঠাৎ একটা কথা জয়সিরির মনের ভেতর ঝিলিক দিয়ে উঠলো। সে যে ছোকরাটার কথা কল্পনা করেছে, তাকে হয়তো এখানে দেখা যাবে। জয়সিরি এবার ভীড় ঠেলে ঠেলে তাকে খুঁজতে লাগলো।

কিন্তু কোথাও তেমন কেউ নেই।

জোরে পা চালালে মেয়েটিকে ধরে ফেলা যায়। তারপর পায়ের গতি কমিয়ে দিয়ে তার সাথে আলাপ করতেও বাধা নেই। জয়সিরি ঘুরে দাঁড়িয়ে মেয়েটির পিছু নিলো। একটুখানি ব্যবধান রেখে। মেয়েটির কোনো তাড়াহুড়ো নেই। সে ধীরে ধীরে হাঁটছে। চলনটা যেন রাজহংসীর মতো। কয়েক মিনিটেই জয়সিরিকে পাগল করে ফেলেছে। সেকেণ্ড লেনের আর সব ছেলের দশাও কি তারই মতো? তারাও কি ওই রাজহংসীর চলন দেখে ধরাশায়ী হয়েছে? নাকি, কোনো জয়ের উল্লাসে দিশেহারা?

মেয়েটি ওয়ার্ড প্লেস দিয়ে খানিকটা এগিয়ে গেল। সামনে চক্ষু হাসপাতালের মোড়। তারপর একটা বাস স্টপ। জায়গাটায় খুব ভীড়। জয়সিরি ধরে নিলো, এ-ভীড়ে মেয়েটি তাকে দেখতে পায়নি। সে যে, বাসে উঠবে, জয়সিরিও তাতেই উঠে পড়বে।

জয়সিরি এবার অপেক্ষা করতে লাগলো।

বাসখানা একেবারে ভর্তি। তবু মেয়েটি কোনো রকমে উঠে

পড়লো। জয়সিরিও। মেয়েটি বসবার জায়গা পেয়েছে। জয়সিরি তার সীটের কাছে দাঁড়িয়ে চোরা চোখে তাকে দেখতে লাগলো। যৌবন যেন তার গা থেকে উছলে পড়ছে। এ-মেয়ে সিংহলী হতে পারে না। কী চোখ ধাঁধানো রূপ। বয়েস হয়তো এখনো কুড়ি পেরোয়নি।

বাস চক্ষু হাসপাতালের মোড়ে থামতেই মেয়েটি নেমে পড়লো। এবার তার লক্ষ্য জেনারেল হাসপাতাল। বাসের ভেতর জয়সিরির মনে হচ্ছিলো, মেয়েটি কয়েক বার তার দিকে তাকিয়েছে। কিন্তু এখন তার আর কোনো দিকে খেয়াল নেই। বেশ জোরে হাঁটছে।

একটু পরেই সে ফ্রী মেডিক্যাল সেন্টারের দিকে এগুতে লাগলো। তার নিশ্চয়ই কোনো অসুখ আছে। এবং এখানে চিকিৎসা করায়। আবার নাগেদার হিন্নী মাহাত্যায়ার কথা মনে পড়লো জয়সিরির। এই মেয়েটিও নিশ্চয়ই অমনি সাংঘাতিক কোনো রোগের ওষুধ নিতে এসেছে। সরল মানুষরা কী ভাবে যে এসব মেয়ের রূপ দেখে মজে!

জয়সিরি মেয়েটিকে অনুসরণ করতে করতে রোগীদের টিকেট দেওয়ার জায়গায় গিয়ে দাঁড়ালো।

মেয়েটি একটা টিকেট নিয়ে একখানা বেঞ্চিতে বসে পড়লো। জয়সিরির কাছাকাছিই। একবার তার দিকে তাকালোও। সে এখন নিশ্চয়ই জয়সিরিকে সন্দেহ করছে।

: আপনি কি ওষুধ নিতে এসেছেন?

জয়সিরি এখন টিকেটের টেবিলের লোকটিকে কি জবাব দেবে? হ্যাঁ? তাহলে তো লোকটি তার অসুখের নাম জানতে

চাইবে। অথচ তার কোনো অসুখ নেই। কোনো বিচ্ছিরি রোগ।

: দেখুন, মিস্টার, এটা বেড়ানোর জায়গা নয়। দয়া করে সরে যান, রোগীদের আসতে দিন।

জয়সিরি একবার ভুরু কুঁচকে লোকটির দিকে তাকিয়ে সরে এলো।

লোকটি হয়তো এখনো তার দিকে চেয়ে আছে। কে জানে! দরকার নেই পেছন ফিরে দেখবার। সে সোজা বেরিয়ে পড়লো।

কিন্তু এবার? বেরেল্লার বাস যেখানে থামে, সেখানে দাঁড়িয়ে মেয়েটির জন্যে অপেক্ষা করা যেতে পারে। মেয়েটি নিশ্চয়ই অন্য কোনো অসুখের জন্যে হাসপাতালে এসেছে।

পথ চেয়ে থাকতে থাকতে প্রায় আধ ঘণ্টা পার হয়ে গেল। তারপর সে দেখে, চৌমাথা ঘুরে মেয়েটি এই দিকেই আসছে। জয়সিরি যে তার দিকেই চেয়ে আছে, তাও সে লক্ষ্য করেছে। তার মুখে হাসি। এবং সেও জয়সিরির দিকে চেয়ে আছে।

: অনেকক্ষণ কোনো বাস আসেনি বোধ হয়?

মেয়েটির গলা ভারী মিষ্টি। কিন্তু জয়সিরির যেন তালু পর্যন্ত শুকিয়ে গেল,—কয়েকখানা এসেছিলো। সবই ভর্তি। এই যে—আর একখানা আসছে। এখানায় আমরা যেতে পারি।

দ্রুত পায়ে এগিয়ে গিয়ে মেয়েটি বাসে উঠে পড়লো। তার পেছনে পেছনে জয়সিরিও। এবং এবার সে মেয়েটির পাশেই একটি সীট দখল করে বসলো।

এখন সে ভয় আর আনন্দের দুই বিপরীতমুখী অনুভূতিতে দোল খাচ্ছে। দশ পয়সার দুখানা টিকেট নিয়ে সে একখানা মেয়েটিকে দিয়ে দিলো।

: অনেক ধন্যবাদ। আপনি তো আমাদের বাগানবাড়ীরই একটা ঘরে থাকেন, তাই না? কলতলায় যাওয়ার পথে আপনাকে প্রায়ই দেখি।

: হ্যাঁ। আপনিও আমার খুব পরিচিত। ওষুধের জন্যে এসেছিলেন?

: হ্যাঁ। তবে, আমার নয়। কারালাইন আক্কার। আপনি নিশ্চয়ই ভদ্রমহিলাকে চেনেন? বাগানবাড়ীটার সবাই চেনে তাঁকে। আমি প্রত্যেক সপ্তাহেই তাঁর ডায়াবিটিসের ওষুধ নিতে আউটডোরে আসি।

: আমি মাত্র কয়েকদিন আগে বাগানবাড়ীটায় এসেছি। কলম্বো আমার কাছে খুব পরিচিত নয়। এই জন্যেই কারালাইন আক্কার কথা জানা নেই। উনি আপনার কি হন?

: উনি আমার আত্মীয় নন। আমি শুধু ওঁর কাছে থাকি। আমার মা মারা যাওয়ার পর বাবা আমাকে ওঁর জিম্মায় রেখে যান।

অদ্ভুত বাবা তো!—জয়সিরি মনে মনে বললো।

বাসখানা এখন প্রচণ্ড গর্জন ছেড়ে আরো জোরে ছুটতে শুরু করেছে। জয়সিরির চোখ দুটি বাইরের দিকে। যেন ওয়ার্ড প্লেসটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে। চোখে এই ভান নিয়ে সে নানান কথা ভাবতে লাগলো। কারালাইন আক্কা কে? মা মারা যাওয়ার পর বাবা মেয়েটিকে কারালাইন আক্কার হাতে তুলে দিয়ে গেলেন কেন?

: ওই যে—ওয়ানাথার বাস। যাবেন নাকি, দাদা?

: ঠিক আছে।

জয়সিরি ভেবেছিলো, মানাথামুল্লায় ফেরবার আগে মেয়েটিকে মালিবান হোটেলে নিয়ে গিয়ে চা খাওয়াবে। কিন্তু ইচ্ছেটা তাকে চেপে যেতে হয়। বাসের ভেতরই মেয়েটি তাকে বলছিলো, কারালাইন আক্কার অবস্থা আজ ভালো নয়।

পরের দিনই জয়সিরি কলতলায় রেমিয়েলকে জিজ্ঞেস করলো, কারালাইন আক্কা কে?

: মিসেস রাথু পেরেরা। আপনি তাঁকে চেনেন না? পোর্টে কাজ করেন যে পেরেরা,—ট্রেড ইউনিয়নিস্ট,—তাঁর স্ত্রী। খুব ভালো মানুষ। স্বামীর মতোই।

রেমিয়েল তাঁর আরো কিছু পরিচয় দিলো। জয়সিরি যা জানবার আশা করেনি, তাও। তার অবশ্যি মনে হল, রেমিয়েলের এই দীর্ঘ কেচ্ছায় মেয়েটির সম্পর্কে দুই-একটি কথা বলা উচিত ছিলো। যদিও মেয়েটির কথা ভাবতে গেলেই জয়সিরি ভয়ানক বিব্রত বোধ করে।

: আপনি যদি চান, একদিন আপনাকে রাথু পেরেরার কাছে নিয়ে যাবো। চমৎকার মানুষ।

: কোনো ছুটির দিন ভেবে দেখা যাবে।

: আপনি যদি তাঁর সাথে এক মিনিটও কথা বলেন, তাহলেও অনেক জিনিষ জানতে পারবেন। যা এমনিতে এক বছরেও জানা সম্ভব নয়।

রেমিয়েল একটা পুরোণো টিনে জল ভরে পায়খানার দিকে চলে গেল।

মেয়েটি হয়তো একটু পরেই কলতলায় আসবে। জয়সিরি

অপেক্ষা করতে লাগলো।

কিন্তু বৃথা অপেক্ষা। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকেও তার দেখা পাওয়া গেল না।

জয়সিরি সুতরাং ঘরে ফিরে এলো। তারপর আবার প্রতীক্ষা। প্রায় আধ ঘণ্টা। কিন্তু বালতির যে ঠং ঠং শব্দটি ইঙ্গিত দেয়, সে এদিকে আসছে, তা কোথাও নেই।

এবার বেরিয়ে পড়লো জয়সিরি। রাথু পেরেরার কাছে যাওয়ার ছুতো করে মেয়েটির বাসা খুঁজতে।

মেয়েটি তাকে চিনতে পেরে জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দিলো।

: রাথু পেরেরা কোথায় থাকেন ?

: ও, আপনি ওঁর সাথে দেখা করতে চান ? উনি এখানেই থাকেন। দয়া করে ভেতরে আসুন। পেরেরা কাকা অবশ্যি কাজে বেরিয়েছেন। তবে, কারালাইন আন্টি আছেন। ভেতরে আসুন।

একজন পাতলা মতো মহিলা বেরিয়ে এসে মেয়েটির সাথে কথা বলতে লাগলেন। ভদ্রমহিলার বয়েস প্রৌঢ়ত্বের সীমা পার হয়ে গেছে। তাঁর রানীর মতো ভাবভঙ্গি দেখে জয়সিরি স্বস্তি বোধ করলো। নিজের অজানতেই।

: কমলি, একটা কিছু খেতে-টেতে দে।

কমলি ! জয়সিরি মনে মনে বললো, বেশ মিষ্টি নাম তো !

: আপনি কি আমার স্বামীকে চেনেন ? তিনি সব সময় সমাজসেবার কাজে ব্যস্ত। পোর্টের কয়েকটা ইউনিয়নের কমিটিতে আছেন। এখন আবার ডাক্তার বাবুর কাছ থেকে এই বাড়ীটা কিনে নেয়ার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছেন। গলির লোকদের মধ্যে

ভাগ-বাঁটোয়ারা করে দেবেন বলে। তাঁর ফুরসত একদম নেই। ডাক্তার বাবু তাঁকে ভয় দেখাবার জন্যে গুণ্ডা লাগিয়েছেন। কিন্তু এসবে ভয় পাবেন, সে-জাতের মানুষ তিনি নন।

তারপর প্রসঙ্গ পালটে কারালাইন আক্কা বললেন, কাল কমলির কাছে আমরা শুনছিলাম, আপনি ওর বাস ভাড়া দিয়েছিলেন।

জয়সিরি শুধু বললো, হ্যাঁ।

ইতিমধ্যে চা এসেছিলো। জয়সিরি টেরই পায়নি, দুই-তিন চুমুকেই সে চা-টুকু শেষ করে ফেলেছে।

এবার ভদ্রমহিলা কমলির কিছু পরিচয় দিলেন।

কথাগুলি যেন জয়সিরির মনের ভেতর খোদাই করা হয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পর নিজের কামরায় ফিরে ক্যাম্প খাট খুলে শুয়ে পড়ে সে কথাগুলো মনে মনে নাড়াচড়া করতে লাগলো।

ঘরটা নর্দমার দুর্গন্ধে ভরে আছে। কিন্তু জয়সিরির সেদিকে খেয়াল নেই। সে বিড়বিড় করে কয়েকটি নাম আওড়াতে থাকে। বার বার। চেল্লাইয়া, পঞ্চী, কমলি, রাথু পেরেরা, কারালাইন আক্কা। সবাই ভারতের কেরালা অঞ্চলের মানুষ। চেল্লাইয়া শ্রীলঙ্কায় এসেছিলো শ'খানেক লোকের একটি দলের সাথে, ওয়াল্টার্সে কাজ করতে। পঞ্চীও। সে কোম্পানিটা তাদের শ্রীলঙ্কায় কাজ করাবার জন্যে নিয়ে আসে, তারা বলেছিলো, লোকগুলি বাসা এবং দৈনিক তিন টাকা হারে মজুরি পাবে। কিন্তু সে-কথা তারা রাখেনি। পরে তারা মজুরি বেঁধে দেয় এক টাকা বিশ পয়সা। চেল্লাইয়া তখন

একটা ধর্মঘট সংগঠনের চেষ্টা করেছিলো। সেই অপরাধে তার জেল হয়। এবং তার স্ত্রী পড়ে যায় অসহায় অবস্থায়। দলের লোকগুলি চেল্লাইয়ার এই দশা দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছিলো। কর্তৃপক্ষও তখন নিশ্চিন্ত। তারা বুঝে ফেলেছে, তাদের এইভাবেই দমিয়ে রাখা যাবে।

চেল্লাইয়া যখন জেলে, তখন পত্নীকে সাহায্য করেছে কেরালার অন্য একটা পরিবার। সে কমলির জন্মের মাস কয়েক পরই মারা যায়। তখন চেল্লাইয়ার চাকরি নেই। সে তিন মাসের বাচ্চাটিকে কারালাইন আক্কার হাতে তুলে দেয়।

কমলি বলছিলো, বাবা এখন পেরেরা কাকার ইউনিয়নে কাজ করেন। কিন্তু তাঁর আর আগের সেই শক্তি নেই। হাঁপানিটা যখন বেড়ে যায়, এখানে চলে আসেন। আমি কিছু খনে তৈরি করে দিই।

বাবার কথায় তার গলায় একটা স্নেহ আর সহানুভূতির সুর ফুটে উঠেছিলো। মায়ের প্রসঙ্গে চোখ দুটি জলে ভরে যায়।

: মার সৎকার করেন, এমন সঙ্গতি বাবার ছিলো না। তিনি তাই মড়া নেননি।

রাথু পেরেরার পরিবারের সাথে ওঠাবসা করতে করতে জয়সিরি বদলে গেল। তার চিন্তাধারা এখন অন্য খাতে বয়। আগে সে সপ্তাহে সপ্তাহে বাড়ীতে চিঠি দিতো। আজকাল সেকথা মনেই থাকে না। অবসরের সময়টুকু কমলির কাছেই কেটে যায়। কমলির সাথে কলতলায় নিয়মিত দেখা হয়। তার ফলে ক্রমে ক্রমে মনে একটা মিষ্টি অনুভূতি দানা বেঁধেছে।

জয়সিরির এখন মনে হয়, কমলিকে তার বিয়ে করা উচিত। সঙ্গে সঙ্গে একটি সমস্যা তাকে পীড়া দেয়। কেরালার মেয়েকে বউ করে সে গ্রামে যাবে কেমন করে? বাবা-মা বোন, আর জ্যাঠা মশাইয়ের কথা মনে পড়ে তার। এঁরা ছাড়াও আছেন বিমলা-ফেথ থেরা। কমলিকে বিয়ে করলে হয়তো এঁদের সবাইকে ছাড়তে হবে। দু'পক্ষকে এক চোখে দেখবার সাধ্য তো তার নেই।

তবু একদিন সে কমলির কাছে গিয়ে দাঁড়ালো।

কারালাইন আক্কা এখন অসুখে একেবারে শয্যাশায়ী। নিজের ঘরে চুপ করে শুয়ে আছেন। কমলি বারান্দায় আসতেই জয়সিরি হাত চেপে ধরে তাকে কাছে টেনে নিলো। তারপর দৃঢ় আলিঙ্গনে বেঁধে চুমোর পর চুমো।

একটু পরেই কমলি তার আলিঙ্গন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ভেতরে চলে গেল। যদিও তার মুখে রাগ বা বিরক্তির ছায়া-মাত্রও নেই।

ফেরবার পথে জয়সিরির কিন্তু মনে হল, সে হয়তো কমলির মনে আঘাত দিয়েছে। তবু সে কমলির কোমল দেহলতার কথা ভুলতে পারে না। তাকে সে চুমো খেয়েছে, বুকের কাছে টেনে নিয়েছে,—এসব এক সুখস্বপ্নের স্মৃতির মতো সর্বক্ষণ মনের ভেতর জেগে থাকে।

পরদিন কমলি তার দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো। হাতে বালতি।

জয়সিরি গাঢ় দৃষ্টিতে চেয়ে ডাক দিলো, ভেতরে এসো।

: না, দাদা। বাইরেই দাঁড়াই,—ভেতরে আর আসবো না। তোমাকে ভয় করি বলে নয়। আমি তোমাকে ভালোবাসি,

এই জন্যে। যাকগে। আমি দুই-এক দিনের মধ্যেই তোমার কাছে আসতে চেয়েছিলাম। তবে, বাবার কাছ থেকে একটা স্পষ্ট কিছু শোনা দরকার। তাই ভাবছিলাম, আগে কথাটা শুনি, তারপর আসবো।

: কেন? কি হয়েছে?

: আমরা সামনের মাসে কেরালায় ফিরে যাচ্ছি। বাবাকে ফিরতেই হবে। তার কারণ, তিনি এখানকার নাগরিক নন। তবে, আমার এখানেই জন্ম। আমি তাই এদেশের নাগরিকত্ব নিতে পারি। কিন্তু আমার গরীব বাবাকে আমি একা ছেড়ে দিতে চাইনে। তোমার সাথে যখন পরিচয় হয়, তখন এখানে থেকে যেতে আমার খুব মন চেয়েছে। কিন্তু উপায় নেই। বাবার কাছে আমাকে থাকতেই হবে। তিনি কোনো দিন শান্তির স্বাদ পাননি। শেষ সময়ে তাঁর মুখে আমাকেই জল দিতে হবে।

জয়সিরির ইচ্ছে হল, একবার কমলিকে চুমো খায়। শেষ বারের মতো। এবং এই চুমো দিয়েই বিচ্ছেদের ব্যথাটা মুছে ফেলে। কিন্তু কমলি কিছুতেই ভেতরে আসতে রাজী নয়। তার গলার সুরটা নরম অথচ দৃঢ়।

: আমরা গরীব মানুষ। আমাদের ভালোবাসা একটা আকস্মিক দুর্ঘটনা ছাড়া আর কিছুই নয়, দাদা। দারিদ্র্যই এর পথ আটকে দাঁড়ায়। এই দারিদ্র্য যদি দুর করতে পারো, তাহলেই প্রেম তার স্বাভাবিক মাধুর্য নিয়ে দেখা দেবে। তোমার মতো মানুষকে পাশে পাওয়া একটা বিরাট আশীর্বাদের মতো ব্যাপার, দাদা। কিন্তু এখন যা অবস্থা, তাতে আমাকে সব কিছু ফেলে আগে বাবার কথা ভাবতে হচ্ছে। তিনি কেরালায় ফিরে গেলেও

গরীবদের জন্যে লড়াই চালাবেন। যা শ্রীলঙ্কায় করছিলেন। তিনি জেলে যাবেন, আর, তার ফলে আমি অসহায় হয়ে পড়বো। কিন্তু তাতেই বা কি!

কমলি এবার বালতি নিয়ে চলে গেল। না, কলতলায় নয়, বাসায়। কিন্তু তার বালতির ঠং ঠং আওয়াজটা জয়সিরির কানের ভেতর একটানা গুঞ্জন করে ফিরতে লাগলো। কমলি চোখের আড়ালে অদৃশ্য হওয়ার পরও, বহুক্ষণ।

———